দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

বাংলাদেশি হিন্দু স্বার্থের বিরোধী কাজ করছেন মমতা
—পৃঃ ১১

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন নাগরিকত্ব আইন সংশোধন ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি চালু করা—পৃঃ ২৩

৭১ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ১০ ডিসেম্বর ২০১৮।। ২৩ অগ্রহায়ণ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

নগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিরোধিতা কেন?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১০ ডিসেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

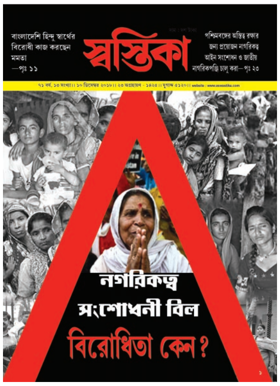

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

পাঁচ রাজ্যের ভোটে এগিয়ে আছে বিজেপি □ গূঢ়পুরুষ □ ৬

খোলা চিঠি : চোলাই আমাদের ভিত্তি, ক্ষতিপূরণেই ভবিষ্যৎ □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

ভারতকে সন্ত্রাসের মোকাবিলায় নতুনভাবে তৈরি হতে হবে □ জয় পণ্ডা □ ৮

বাংলাদেশি হিন্দু স্বার্থের বিরোধী কাজ করছেন মমতা □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১১

উনিশের নির্বাচন আসলে ভারতীয়ত্ব রক্ষার মহাসংগ্রাম □ সাধন কুমার পাল □ ১৩

হিন্দুরা কি শুধু ঘুমিয়েই থাকবে? □ ডা: আর এন দাস □ ১৬

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন নাগরিকত্ব আইন সংশোধন ও জাতীয় নাগরিকত্ব চালু করা □ মোহিত রায় □ ২৩

বিল পাশে প্রধান বাধা ভোটের লালসা □ দেবযানী ভট্টাচার্য □ ২৬

অতীত ভুলে আত্মহননে মত্ত হিন্দু বাঙালি □ আবীর গাঙ্গুলি □ ২৮

১০৮-এর গুরুত্ব □ রাজদীপ মিশ্র □ ৩১

সুবর্ণবিহার ও পিণ্ডবিহার □ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৩

সেকালের শ্রেষ্ঠী থেকে আজকের ব্যবসায়ী □ সন্দীপ সিংহ □ ৩৫

বাঙ্গালিকে দেশপ্রেম ভোলাতেই হবে □ ড. জিষ্ণু বসু □ ৩৭

নন্দন ও জঙ্গলখাস মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছে □ সনাতন রায় □ ৪৩

বৈবাহিক সম্পর্ক ও পরকীয়া এক সঙ্গে চলতে পারে না □ নরেন্দ্র নাথ মাহাতো □ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩০** □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □ **চিত্রকথা : ৪০** □ **রঙ্গম : ৪১** □ **খেলা : ৪১** □ **অন্যরকম : ৪২** □ **রঙ্গম : ৪৯** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১৭ ডিসেম্বর
২০১৮

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১৭ ডিসেম্বর
২০১৮

দুর্গা বনাম রাম

ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতির নতুন রূপায়ণপদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করেছেন, রাবণবধের পূর্বে রাম দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। সুতরাং দুর্গা শ্রেষ্ঠ, রাম নন। ভারতের জাতীয় সত্তার প্রতীকপুরুষ হিসেবে রাম দেশের ঘরে ঘরে বন্দিত। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গা বাঙ্গালির মননে চিরভাস্বর। মমতার উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গকে এবং বাঙ্গালিকে ভারতীয় জাতিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তিনি রাম এবং দুর্গার শরণাপন্ন হয়েছেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— রাম বনাম দুর্গা। লিখবেন এইসময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দু শরণার্থীর স্বার্থেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল

নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইনটিতে কিছু পরিবর্তন আনিবার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি সংসদে পেশ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে বলা হইয়াছে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ হইতে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মীয় সংখ্যালঘু শরণার্থীদের এই দেশে নাগরিকত্বের সুবিধা প্রদান করা হইবে। এই সংশোধনী আনিবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণার্থী বিষয়ক সংজ্ঞাটিকেই মান্যতা দিয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহার শরণার্থী বিষয়ক সংজ্ঞায় বলিয়াছে, যদি কোনও ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রে ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক কারণে অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত হয়, নিরাপত্তার অভাব বোধ করিতে থাকে এবং তজ্জনিত কারণে অন্য কোনও রাষ্ট্রে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে সে শরণার্থী। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সেই দেশভাগ পর্বের পর হইতে এই পর্যন্ত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ হইতে যেসকল হিন্দু অত্যাচারিত, নিপীড়িত হইয়া এই দেশে আশ্রয় লইয়াছে—তাহারা সকলেই শরণার্থী। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের অত্যাচারিত হিন্দুরা যে বরাবর নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারত রাষ্ট্রের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন—তাহাতে অন্যায়ের কিছু নাই। মনে রাখিতে হইবে, এই দেশটি ভাগ হইয়াছিল ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ইসলামি রাষ্ট্রের দাবি তুলিয়া মুসলিম লিগ পাকিস্তান ছিনাইয়া লইয়াছিল। স্বাভাবিক ভাবেই, সেই সময় কার্যত ইহাও স্বীকৃত হইয়াছিল যে, ভারত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর আবাসভূমি। ফলে প্রতিবেশী দেশে অত্যাচারিত হিন্দুরা ভারতেই আশ্রয় খুঁজিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন এই অত্যাচারিত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখদের পাশে দাঁড়াইতে চাহিতেছে—তখন তাহাতে বাদ সাধিয়াছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বামপন্থীদের মতো তথাকথিত সেকুলাররা। তাহারা বায়না ধরিয়াছে, এই বিলে মুসলমানদেরও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই সেকুলারদের বক্তব্য—বাংলাদেশ ও পাকিস্তান হইতে অবৈধ উপায়ে আসা মুসলমানদেরও এই দেশে নাগরিকত্বের সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। অথচ, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংজ্ঞায় পরিষ্কার বলা হইয়াছে, যাহারা অত্যাচারিত হইয়া নয়, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে অবৈধ উপায়ে অন্য কোনও রাষ্ট্রে বেআইনিভাবে প্রবেশ করিতেছে—তাহারাই অনুপ্রবেশকারী। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান হইতে অবৈধ উপায়ে এই দেশে প্রবেশ করা মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারী। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বামপন্থীদের মতো তথাকথিত এই সেকুলার দলগুলির এহেন দাবির পিছনে তাহাদের প্রকৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার বুঝা যায়। বুঝা যায়, তাহারা আসলে মুসলমান তোষণের রাজনীতিটি আশ্রয় করিয়া নির্বাচনী বৈতরণী পার হইতে চাহেন। অত্যাচারিত হিন্দুর চোখের জলের কোনও মূল্য তাহাদের কাছে নাই। বস্তুত এই বিরোধীদের অন্যায় বিরোধিতার কারণেই এই বিলটি এতদিন সংসদে পাশ করানো যায় নাই।

ইতিমধ্যে নাগরিক পঞ্জিকরণকে কেন্দ্র করিয়া তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ হইতে আগত হিন্দু শরণার্থীদের বিভ্রান্ত করিতেছেন। বলিতেছেন, নাগরিক পঞ্জিকরণের ফলে হিন্দু শরণার্থীদেরও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হইবে। অথচ বাস্তবটি হইল, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মূল উদ্দেশ্যই হইল এই হিন্দু শরণার্থীদের পাকাপাকিভাবে এই দেশে বসবাসের সুযোগ করিয়া দেওয়া। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানদের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করিতে আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের মুখোশ যত শীঘ্র সম্ভব খুলিয়া দেওয়া অতীব জরুরি।

সুভাষিতম্

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষয়েৎ বিত্তমায়াতি যাতি চ।
অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো হতঃ।।

চরিত্রকে যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে হয়। ধন আসে ও যায়; ধনের অভাবে কেউ দুর্বল হয় না। কিন্তু চরিত্র দুর্বল হলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়।

পাঁচ রাজ্যের ভোটে এগিয়ে আছে বিজেপি

দেশের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার ভোটের ফলাফল প্রকাশ পাবে ১১ ডিসেম্বর। অর্থাৎ আর মাত্র দু' একটা দিন। অনুমান করা যাবে ২০১৯ এর লোকসভার নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরছে কিনা। সে প্রসঙ্গে আসার আগে একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে পাঁচ রাজ্যেই ভোট হয়েছে শান্তিতে। কোথাও ভোটে কারচুপির অভিযোগ বিরোধীরা করেনি। গড়পড়তা ৭৫ শতাংশ ভোটদাতা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় এতটা ভালো ভোট এর আগে হয়নি। বিশেষত ছত্তিশগড়ের মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায়। মাওবাদীদের ভোট বয়কটের হুমকি উপেক্ষা করে দলে দলে ভোটদাতারা সকাল থেকেই ভোট কেন্দ্রের বাইরে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন গণতান্ত্রিক ভারতে মানুষ হিংসার রাজনীতি চলতে দেবেন না। এটাই বড় জয়। গণতন্ত্রের জয়।

সংবাদমাধ্যমের ভোট সমীক্ষায় আগেই বলা হয়েছিল মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে। কারণ বিজেপি টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও দুই রাজ্যে তেমন উন্নয়ন হয়নি। কথাটা মানতে পারলাম না। মানুষের মনে ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলে ভোটের দিন তার কিছুটা প্রতিফলন চোখে পড়তো। অনেকেরই মনে আছে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোটের সময় রাজ্যজুড়ে বামফ্রন্ট যথেষ্ট ব্যাকফুটে ছিল। বাম বিরোধী হাওয়া ঝড়ের মতো আছড়ে পড়তে চলেছে তা কট্টর বাম সমর্থকরাও বুঝেছিলেন। সিঙ্গুর- নন্দীগ্রামের কৃষক বিদ্রোহ উপলক্ষ্য ছিল। আসলে রাজ্যের মানুষ সিপিএমকে সরাতে চেয়েছিলেন। সারা দেশ যখন এগিয়ে চলেছে তখন বামেরা পশ্চিমবঙ্গকে ক্রমাগত পিছিয়ে দিচ্ছিল। সস্তা স্লোগান সর্বস্ব বামপন্থীরা বিশ্বাস করেছিল যে বাংলার মাটি নাকি তাদের দুর্জয় ঘাঁটি। তা যে নয় জনবিচ্ছিন্ন পার্টির বুঝতে সময় লেগেছিল।

সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে দল ইভিএম কারচুপি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সরব হয় তারা আগেই মনে মনে হার স্বীকার করে নেয়। মধ্যপ্রদেশে

গূঢ় পুরুষের
কলম

ইভিএমে ভোট চুরি হতে পারে বলে নির্বাচন কমিশনকে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন কংগ্রেস সেনাপতি জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। ভোটের পর তিনি সার্টিফিকেট দিলেন, 'ভালো ভোট হয়েছে। আমরাই সরকার গড়ছি।' পাঁচ রাজ্যের মধ্যে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে। এই তিন রাজ্যে বিজেপি তার গড় রক্ষা করতে পারলে চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যাবে যে কেন্দ্রে মোদী সরকারই ক্ষমতায় ফিরছে। মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে বিজেপির জয় নিশ্চিত। সমস্যাটা রাজস্থানকে নিয়ে। যতটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হয় দলের সঙ্গে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ারাজ সিন্ধিয়ার ব্যক্তিগত সম্পর্ক মধুর নয়। কোথাও একটা বড়সড় ফাটল আছে। তবে রাজনীতিতে মত পার্থক্য থাকেই। প্রশ্নটা হচ্ছে, মত পার্থক্যের জন্য রাজ্যের উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কিনা। উত্তর, না হয়নি। সরকার তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। সরকারের সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির কাজ ৯০ শতাংশ হয়েছে। আর হয়েছে বলেই কংগ্রেস-বামপন্থীদের জোট কৃষকদের ভুখা মিছিল রাজস্থান থেকে দিল্লি নিয়ে যেতে পারেনি। বলা হচ্ছে, বিজেপি হিন্দুত্বের প্রচার করে সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলছে। বলা হচ্ছে, পাঠ্য পুস্তকে রাজস্থানের অতীত গৌরব প্রচার করছে বিজেপি সরকার। ইংরেজের লেখা রাজস্থানের ইতিহাসে আছে হলদিঘাটের যুদ্ধে আকবরের সেনারা মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহকে পরাজিত করে মেবার জয় করে। ভারতের ইতিহাসবিদরা বলছেন, হলদিঘাটের লড়াইতে জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। যুদ্ধ চলেছিল দশকের পর দশক ধরে। শেষ পর্যন্ত সন্ধি করতে বাধ্য হন মুঘল সম্রাট আকবর। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কোনটা বিশ্বাস করবো? সাহেবরা লিখলেই সেটাই ঠিক। আর দেশের পণ্ডিতরা লিখলে তা কাল্পনিক গল্প। এমনটা চলতে পারে না। হলদিঘাটের যুদ্ধের পরেও যে রাণা প্রতাপ যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন সেকথা কি অস্বীকার করা যায়? বাংলার সন্তান বিজয় সিংহ হেলায় লঙ্কা জয় করলে বাঙালি রোমাঞ্চিত হয়। রাণা প্রতাপের সুদীর্ঘ স্বাধীনতার যুদ্ধ তবে কাল্পনিক গল্প হবে কেন?

রাজস্থানের কয়েকটি কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রভাব থাকলেও সার্বিকভাবে বিজেপির পক্ষেই পাল্লা ভারি। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত জনবিচ্ছিন্নতার জন্য আম জনতা বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, বিশ্বাস করি না। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান বিজেপির দখলেই থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। চল্লিশ আসনের মিজোরাম বিধানসভা এবার কংগ্রেসের হাতছাড়া হতে চলেছে। একমাত্র তেলেঙ্গনা রাজ্যে বিজেপির উপস্থিতি নগণ্য। সেখানে বর্তমানে ক্ষমতাসীন কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের তেলেঙ্গনা রাষ্ট্রীয় সমিতি রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তেলুগু দেশমকে হারাতে পারলে বিজেপির শক্তি বাড়বে। কারণ, চন্দ্রশেখর রাও জিতলে তাঁর দল টি আর এস এন ডিএ-র শরিক হবেন। ■

চোলাই আমাদের ভিত্তি, ক্ষতিপূরণেই ভবিষ্যৎ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

দিদি গো,

তুমিই বোঝো। আর কেউ বোঝে না। তোমাতে আমি এতটাই আপ্লুত যে এই প্রথমবার তুমি সম্বোধন করে ফেললাম। জানি তুমি মানে আপনি মনে কিছু করবেন না। সার সত্য কথাটা এবার লিখেই ফেলি।

মদ খেলেই কেউ মরে না। মৃত্যুর দিকে এগোতে পারে, কিন্তু মরে না। বিষ মদ খেলে মরে। তবে সেটা লটারির মতো। কেউ মরে লাভবান হয়। মানে তার পরিবার লাভ পায়, সরকার পুরস্কার দেয়। তাই শুনতে খারাপ লাগলেও বলছি— মদ যদি খেতেই হয় তবে বিষ মদ পান করুন। পরিবারটা অন্তত বাঁচবে।

একবার দেখে নেওয়া যাক, শান্তিপুরে বিষ মদ কাণ্ডে এত বড় সংখ্যায় মৃত্যুর পরে আপনার প্রশাসনের পদক্ষেপগুলো ঠিক কী রকম? এক পুলিশ কর্তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো, আবগারি দপ্তরের একজন ওসি ও দুই সার্কেল ইনস্পেক্টর-সহ এগারোজন আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হলো, রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ কর্তারা মুখ্যমন্ত্রী আপনার ধমক খেলেন আর মগরাহাট কাণ্ডের পর থেকে কটাক্ষের ছলে মুখে মুখে ফিরতে থাকা একটা আর্থিক সহায়তার অঙ্ক মৃতদের পরিবারগুলিকে দেওয়ার বন্দোবস্ত হলো। অর্থাৎ গতানুগতিকতার বাইরে কিছুই ঘটল না এবারও।

এতে কী প্রমাণ হয়? মানে ইতরজন বলছে— এতে প্রমাণ হয় যে, বিপর্যয় যত বড় আকারেই ঘটুক না কেন, বিপর্যয় পরবর্তী সাময়িক তৎপরতাটাই সব, তার বাইরে কিছু করতে শিখিনি আমরা। বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটতে না দেওয়ার জন্য যে সব পদক্ষেপ করা দরকার এবং যে ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, সেসব আমাদের প্রশাসন এখনও শিখে উঠতে পারেনি। আমাদের প্রশাসনের কাছে বিপর্যয় মোকাবিলা এখনও 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' প্রক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ। বিপর্যয় মোকাবিলার অর্থ যে সর্বাগ্রে বিপর্যয় রোধের চেষ্টা করা, আমাদের প্রশাসন সম্ভবত, তা এখনও ভেবে উঠতে পারেনি।

ছাড়ুন তো দিদি ওদের কথা। ওরা সবেতেই সমালোচনা করে। আপনি কতটা মহানুভব যে কয়েকজনের মৃত্যুর পরেই আর অনেকের মৃত্যুর আগেই ক্ষতিপূরণ নামক গাজরটা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। মদ্যপকে বাঁচানোর চেয়ে গরিবগুর্বোগুলোর কাছে দুই-ই লাখ টাকা অনেক বড় তা আপনি ছাড়া কে বুঝবে। মা-মাটি-মানুষের পাল্স্ বোঝায় আপনিই সেরা।

একজন বিজ্ঞ সেদিন সাধু ভাষায় বলছিলেন— মদ্যের চোরাকারবারিদের উপকার করা রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য নহে। তাহারা মৃতের পরিবারের পার্শ্বে দাঁড়াতেই চাহে। দুর্জনে বলিবে, তাঁহাদের ভোট আছে বলিয়াই। প্রশ্ন হইলে, মৃত্যু যতই দুর্ভাগ্যজনক হউক, মৃতের পরিবার যত বড়ো সঙ্কটেই পড়ুক, তাহাতে রাজ্য সরকারের দায় কোথায়? দায় না থাকিলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া কেন? অবশ্য, কেহ বলিতে পারেন যে রাজ্য সরকার অবৈধ চোলাই মদ্যের ব্যবসা ঠেকাইতে না পারিবার দায় স্বীকার করিয়া লইতেছে। জানাইতেছে, প্রশাসনের সেই ব্যর্থতার ফলেই এতগুলি মানুষের মৃত্যু। অতএব, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এই যুক্তির সহিত সহমত প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার ক্ষমতায় থাকা লইয়াই প্রশ্ন উঠিবে। আর, যদি ক্ষতিপূরণকে প্রশাসনিক ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি হিসাবে না দেখেন, তবে জবাব দিতে হইবে, এই ক্ষতিপূরণ কেন?

এসব প্রশ্নের জবাব যে আপনি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করবেন না তা আমি জানি। আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ তাই এগুলি শুনিয়াও না শুনিবার ভান করা আপনার আয়ত্তে। তবে দিদি আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি। ছোটো ভাই ভেবে শুনুন। মানতে হবে না।

এবার দিদি, বিষ মদের ডিস্ট্রিবিউটরশিপটাও আপনি নিয়ে নিন। আয় বাড়বেই বাড়বে। সঙ্গে প্রতি বোতলে ৫ টাকা করে বিমা করিয়ে নিন। মরে গেলে আপনাকে আর টানাটানির কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। সেটা দেবে বিমাসংস্থা।

বুদ্ধিটা কেমন! পছন্দ হলো না! রেগে যাচ্ছেন নাকি! তবে থাক। যা ভালো বোঝেন করুন। ঠিক আছে তবে সরকারের আয় বাড়াতে স্লোগান দিয়েই চিঠি শেষ করছি—ঢুক ঢুক পিও, যুগ যুগ জিও...

— সুন্দর মৌলিক

সন্ত্রাসের মোকাবিলায় ভারতকে নতুন ভাবে তৈরি হতে হবে

অতিথি কলম

জয় পণ্ডা

গত সপ্তাহেই ভারতে সন্ত্রাসী কাজকর্মের তুঙ্গী সাফল্য ২৬/১১-র কুখ্যাত দিনটি দেশবাসী স্মরণ করল। ইতিহাসের দিকে একটু তাকালে দেখা যাবে স্বাধীনতা অর্জনের উন্মেষ রাত্রিতে নেহরু দেশের সদ্য অর্জিত স্বাধীনতাকে বর্ণময় হিসেবে বোঝাতে জাতির উদ্দেশে যে ‘famous tryst with destiny’ অর্থাৎ ‘বিখ্যাত পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতির’ কথা উল্লেখ করেছিলেন তার ঠিক এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই পাকিস্তানি মদতে non State Actor-এর দল ভারতভূমির জম্মু ও কাশ্মীরে সশস্ত্র অনুপ্রবেশ ঘটায়। একথা সকলেই জানেন যে, জম্মু-কাশ্মীরের দীর্ঘ দিন আগে ভারতভুক্তি সত্ত্বেও বেশ কটি যুদ্ধ ও সন্ত্রাস উপশমের জন্য অসংখ্য শান্তি প্রক্রিয়া চালানো সত্ত্বেও আজও সন্ত্রাসের বিরাম নেই। দশ বছর আগের সেই বিধ্বংসী ওলটপালট করে দেওয়া তিন দিনের তীব্র আবেগ ও শোকের অভিঘাতকে ঠাণ্ডা মাথায় পর্যালোচনা করা, তাকে কঠিন চোখে দেখার সময় এসেছে। কী কারণে এই সর্বনাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল? আমরা কি কোনও শিক্ষা নিয়েছি? আজকে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে আমাদের মোকাবিলার প্রস্তুতি কি উপযুক্ত? বলে রাখা ভালো, আমাদের মতো দেশভাগের বেশ পরে জন্মানো প্রজন্মের ভিতর আমাদের পূর্বপুরুষরা দেশভাগজনিত যন্ত্রণার শিকার হয়ে মনে প্রাণে যে পাকিস্তান বিরোধিতার ভাবাবেগ পোষণ করেন, সে তীব্রতা কিন্তু নেই। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আবার আমাদের যারা ৭০ ও ৮০'র দশকে বড় হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে ৭১-এর যুদ্ধের অতি ক্ষীণ স্মৃতি জীবিত আছে বা আদৌ নেই। দেশভাগ ও পরবর্তী বেসরকারি পাক-আগ্রাসনের তো প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের মধ্যে প্রচলিত তথা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছিল ‘বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে চল, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন live & let live আপ্তবাক্য অনুসরণ করে নিজের উন্নতির চিন্তা কর।’ বিশেষ করে ১৯৯১ সালে দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হওয়ার পর বিষয়টা কার্পেটের তলায় চলে যায়। কিন্তু আমাদের শেখার বা বোঝার যা-ই বলুন তা বাকি ছিল। পড়শি দেশ পাকিস্তান কিন্তু একটি বিকল্প ও আমাদের থেকে চিন্তাসূত্রে সম্পূর্ণ আলাদা বিশ্বে বসবাস শুরু করে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর তাদের দেশের ধর্মীয় মৌলবাদীরা দেশের ভীত নাগরিকদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। কখনও কখনও সময়ের আবর্তনে গণতন্ত্র নামের বস্তুটির কিছুটা আবছায়া মূর্তি সে দেশের নাগরকিরা দেখে থাকতে পারে। তবে তাদের অভিজ্ঞতা মূলত ঘুষখোরদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অতি সাময়িক গণতান্ত্রিক প্রথার সঙ্গে। সম্পূর্ণ অপদস্থ হলেও তা মানতে নারাজ সেনাবাহিনীই একচেটিয়াভাবে পাকিস্তানের ভারতমুখী নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে বেছে নেওয়ার পরম্পরা আজ পাকিস্তানের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংক্রামিত হচ্ছে। একে ঝেড়ে ফেলা পাকিস্তানের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে ১৯৮৭ সালের জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্রীয় সরকারের খাটো করে দেখার ফলে আমাদের অতীতে উপার্জিত লাভজনক পরিস্থিতিকে আমরা ধরে রাখতে ব্যর্থ হই। এরপর সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসের আমদানি ও একই সঙ্গে এথনিক ক্লিনজিং-এর ফলে দলে দলে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিতাড়ন সমগ্র পরিস্থিতিকে আমূল বদলে দেয়। এর ফলে যাবতীয় শান্তি প্রক্রিয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে ভারত যতই তার আন্তরিকতা প্রকাশের চেষ্টা করুক না কেন কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

ধীরে ধীরে বহু সংখ্যক ভারতীয়দের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে আসে যে তাদের অনুসৃত Live & let live-এর স্লোগানে অন্যপক্ষ আদৌ উৎসাহিত নয়। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন তার বহু আকাঙ্ক্ষিত লাহোর বাস যাত্রায় কূটনীতির ডালি নিয়ে পাকিস্তানে পৌঁছলেন, পাকিস্তানের সেই সময়কার সেনাধ্যক্ষ পারভেজ মুশারফ তাঁকে প্রথাগত অভিবাদন জানাননি। সেই মুহূর্তেই বাজপেয়ীর শুভেচ্ছা যাত্রাটি দুর্ভাগ্যের যাত্রায় পর্যবসিত হয়ে যায়। একই সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আমাদের বোঝা দরকার ছিল যে দীর্ঘশত্রুতার আবহই তারা উপভোগ করতে চায়। আমরা কিন্তু প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের কথা তখনও ভাবতে ব্যর্থ হলাম। অতর্কিতে কার্গিল যুদ্ধ শুরু হতে আমরা হতবাক হয়ে যাই।

বলতে দ্বিধা নেই দেশের যে সমস্ত নাগরিক বিশ্বাস করত যে ভারত যদি নীতিগতভাবে একটু নমনীয় হয়, একটু বোঝার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে হয়তো পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তির সম্ভাবনা সম্ভব। কার্গিল যুদ্ধ তাদের কাছে একটা বড় ধাক্কা। নাগরিকদের বৃহত্তর অংশ এইবার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, আমরা যতই

নমনীয় হই না কেন--- পাকিস্তান বা নিদেনপক্ষে তার সেনাবাহিনী অন্তর থেকে মনে করে যে তাঁদের বেঁচে থাকার পক্ষে ভারতের অস্তিত্ব ভীতিপ্রদ।

পরিস্থিতি আমার মতো অনেককেই বুঝতে বাধ্য করেছে যে যতক্ষণ না পাকিস্তান আর পাঁচটা দেশের মতো গড়ে ওঠে যেখানে দেশের সেনাকর্তা নয়, নির্বাচিত সরকারের প্রধানই শাসন পরিচালনায় শেষ কথা বলবে ততক্ষণ পাকিস্তানের সঙ্গে স্থায়ী শান্তির কোনও সম্ভবনা নেই। এই অবস্থা আনতে বেশ সময় লাগবে, হয়তো আরও একটি প্রজন্ম পার হয়ে যেতে পারে বা তার থেকেও বেশি সময়। সেই ক্ষণ সমাগত হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের তরফে নমনীয়তা প্রদর্শনের কোনও জায়গা নেই। শান্তি তো দূরস্থান তীব্র বৈরিতা উপশমই সম্ভব নয়।

এই সূত্রেই প্রশ্ন আসে কুখ্যাত সেই হত্যালীলার পর সন্ত্রাসবাদী হিংসা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে আমরা কতটা তৈরি। চতুর্দিকের নানান তর্কবিতর্কের মধ্যে থেকে আড়াআড়ি বিভাজিত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের তীব্র শোরগোলে আলাদাভাবে চিহ্নিত না করা গেলেও এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, আমাদের সন্ত্রাস প্রস্তুতির ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে। অবশ্যই অনেক কাজ বাকি আছে। কেবলমাত্র সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদই যে ভারতের পক্ষে আশঙ্কার বিষয় তা নয়। উগ্র বামপন্থা ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিনতাবাদের কথাও ছেড়ে দেওয়া যায় না। মানতেই হবে, এই ক্ষেত্রে সেনাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যারা গুরুত্ব দিয়ে খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা দেখতে পারেন ২০০৯ সাল থেকে বামপন্থী উগ্রপন্থার হিংসার ঘটনায় ৬০ শতাংশ ভাঁটা পড়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তর মোট ৪৪টি জেলাকে উগ্রবামপন্থা আক্রান্ত জেলার তালিকা থেকে বাতিল করেছে। এর ফলে বর্তমানে আক্রান্ত উত্তর পূর্বে সেই একই ধরনের উন্নতি নজরে পড়েছে। গত বছরে ত্রিপুরা ও মিজোরাম থেকে কোনও সশস্ত্র দেশবিরোধী ঘটনা সংগঠিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। মণিপুরে অস্থিরতা কিছুটা বজায় থাকলেও, সামগ্রিকভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী ঘটনার প্রবণতা অনেক কমে এসেছে। অনেকগুলি জঙ্গি সংগঠনই ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে। অনেকগুলি সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসছে।

২৬/১১-র সন্ত্রাসী হামলার পর থেকেই সরকারের নেওয়া বেশ কিছু জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কয়েক বছর ধরে অত্যন্ত ধৈর্য ও কুশলতার সঙ্গে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছে। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলির নিরাপত্তা বাড়াতে তিন ধাপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর মাল্টি এজেন্সি সেন্টার (এমএসি) ২৪×৭ ঘণ্টা প্রস্তুত থাকছে। এছাড়া আরও কিছু আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা-সক্ষম কৌশলও প্রস্তুত রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তারক্ষক (ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড) হিসেবে ১.৩৫ লক্ষ নতুন নিয়োগ হয়েছে। আরও ৫৫ হাজার নিযুক্তির অপেক্ষায়। পরিশেষে, সারা বিশ্বে ধিক্কার পাওয়ার পরও পাকিস্তানের গাজোয়ারি ভাবে ভাঁটা তো পড়েইনি, উপরন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ-সহ সব ক্ষেত্রেই সে চতুর চীনের সমর্থনে লাঠি ঘোরাচ্ছে। ভারতকে বিষয়টা সমান কৌশলে কূটনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার সঙ্গে দক্ষ সমান্তরাল ভাবে সন্ত্রাসবাদী হামলা দমনের প্রস্তুতিকে সর্বোচ্চ ধাপের দিকে তুলতে হবে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

“বিশ্বে ধিক্কার পাওয়ার পরও পাকিস্তানের গাজোয়ারিতে ভাঁটা তো পড়েইনি, উপরন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ-সহ সব ক্ষেত্রেই সে চতুর চীনের সমর্থনে লাঠি ঘোরাচ্ছে। ভারতকে বিষয়টা সমান কৌশলে কূটনৈতিকভাবে মোকাবিলা করে দক্ষতার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী হামলা দমনের প্রস্তুতিকে সর্বোচ্চ ধাপের দিকে তুলতে হবে।”

রম্যরচনা

পল্টুর পরীক্ষা

পল্টু পরীক্ষায় ফেল করেছে। পল্টুর বাবা জিজ্ঞেস করল— ফেল করলি কেন? পল্টু বলল— সব তো ঠিক ঠিকই লিখেছিলাম। তবু কেন ফেল করলাম জানি না। পল্টুর বাবা জিজ্ঞেস করল— কী প্রশ্ন এসেছিল আর তুই কী লিখলি? পল্টু বলল ,প্রশ্ন এসেছিল— সূর্য কোন দিকে ওঠে? আমি লিখেছি রোজ তো পূর্বদিকেই ওঠে। তবে বাবা যেদিন বাড়ির কাজ করে দেয় সেদিন কোন দিকে ওঠে জানি না। কারণ, মা সেদিন অবাক হয়ে বলে সূর্য আজ কোন দিকে উঠল রে? বাবা হতবাক। জিজ্ঞেস করল— আর কী প্রশ্ন এসেছিল? পল্টু বলল— প্রশ্ন এসেছিল, জেলখানা কাকে বলে? আমি লিখেছি— আমাদের বাড়ি। কেননা, মা তো রোজই বলে এই জেলখানায় বন্দি হয়ে আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল। এই পর্যন্ত শুনে পল্টুর বাবা অজ্ঞান।

উবাচ

“ সংসদে যেভাবে আইন প্রণয়ন করে সোমনাথ মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই শীতকালীন অধিবেশনে রামমন্দির নির্মাণে আইন করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত। কিন্তু রামমন্দির নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। ”

হরিশঙ্কর
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

ধুবড়ীতে এক হিন্দু সমাবেশে রামমন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে

“ কংগ্রেস মিথ্যা ছড়ানোর বিশ্ববিদ্যালয়। যে বেশি মিথ্যা বলতে পারছে, সে নতুন দলীয় পদ পেয়ে যাচ্ছ। ”

রাহুল গান্ধীর মিথ্যাচার প্রসঙ্গে রাজস্থানে যোধপুরের জনসভায়।

নরেন্দ্র মাদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

“ তেলেঙ্গানায় যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে, তাহলে হায়দরাবাদের নিজামের মতো আসাদুদ্দিন ওয়েসিকেও রাজ্য ছেড়ে পালাতে হবে। ”

আসাদুদ্দিন ওয়েসির সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানো প্রসঙ্গে তেলেঙ্গানার এক জনসভায়।

যোগী আদিত্যনাথ
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

“ অসমের উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙ্গালিদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমি নিশ্চিত, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হবেই। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। ”

কবীন্দ্র পুরকায়স্থ
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

অসমের এনআরসি নিয়ে অপপ্রচার প্রসঙ্গে

বাংলাদেশি হিন্দু স্বার্থের বিরোধী কাজ করছেন মমতা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

'সেই রাতেই কুখ্যাত মৃত্যুদূতেরা সশস্ত্র হানা দিল আমাদের বাড়িতে। লাথি মেরে দরজা ভেঙে টেনে বের করল বাবা মামা আর দাদাদের। রাইফেল উঁচিয়ে টেনে নিয়ে গেল অন্ধকারে। আধো অন্ধকারে তাদের চেনা গেল। তারা আমাদের গ্রামের হাতেম আলি, রহমান মিঞা আর বাসাবাটির মওলানার মদতপুষ্ট এনায়েতের ভাই ছোট্ট। তাদের আরও দুই সঙ্গী বিষ্ণুপুর কলাগাছিয়ার দুই দুষ্কৃতী। মা মঞ্জুকে বুকে জড়িয়ে অন্ধকার ঠাকুর ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। মায়ের বুক থেকে ওরা হ্যাঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিল মঞ্জুকে। মা উপুড় হয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল একজনের পা। চিৎকার করে উঠল— তোমাদের পায়ে পড়ি ওকে ছেড়ে দাও...। একটা লাথি পড়ল মা-র মুখে। অন্ধকার রাত ভেদ করে 'বাঁচাও, অ-মা আমাকে বাঁচাও' আর্তচিৎকারে কেঁপে উঠল সারা গ্রাম। পুঁটিমারি রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে ছুটেও মা মঞ্জুকে বাঁচানোর জন্য কিছুই করতে পারল না।

...মঞ্জুর হাতের লাল চুড়ির টুকরোগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল পুঁটিমারির কাদামাটির কূলে।' 'স্বর্ণলতার শোভা' শীর্ষক লেখায় এই স্মৃতিচারণাটি করেছেন সুদীপ অধিকারী। প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মী, বর্তমানে ঠাকুরপুকুর নিবাসী। বাংলাদেশের বাগেরহাট থেকে দেশভাগের সময় উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিলেন এদেশে। সেই ৪৭ সালে। সত্তর বছর হয়ে গেল, তবু বুকের ভিতর এখন ক্ষতের মতো রয়ে গিয়েছে সেই স্মৃতি। সুদীপবাবু লিখেছেন, 'প্রতিদিন ঘুমোতে যাই গোয়ালে উঠে যাওয়া সেই স্বর্ণলতাটার কথা মনে করে। যার শোভা অনেক দূরে থেকেও এখনও আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সেই আলোয় মঞ্জু, আমার বোন বেঁচে আছে আমার বুকের মধ্যে, চাঁদ তারা সূর্যের মতো অম্লান অক্ষয় হয়ে।'

গত জুলাই মাসে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ত্রিপুরা গিয়েছিলাম। ওই সময়ই ওখানে অধ্যাপক অরবিন্দ মাহাতোর সঙ্গে পরিচয় হয়। অরবিন্দবাবু ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সরকারি সমীক্ষার কাজেই তাঁকে মাঝে মাঝে বাংলাদেশ যেতে হয়। ওই বাংলাদেশে যাতায়াতের সূত্রেই তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কাহিনি অরবিন্দবাবু আমাকে শুনিয়েছিলেন। কাহিনিটি এরকম : কয়েকবছর আগে এরকমই একটি সমীক্ষার কাজে অরবিন্দবাবু বাংলাদেশের কুমিল্লায় গিয়েছিলেন। কুমিল্লার একটি ছোট্ট শহরে তখন তাঁকে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। ওই শহরেই এক হিন্দু তরুণ স্কুলশিক্ষক এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অরবিন্দবাবুর পরিচয় ঘটে। ওই স্কুলশিক্ষক এবং তাঁর স্ত্রীর একটি ছোটো পুত্র সন্তানও আছে। তাদের নামও অরবিন্দবাবু আমাকে বলেছিলেন। যদিও সঙ্গত কারণেই আমি তাদের নাম এখানে প্রকাশ করছি না। অরবিন্দবাবু প্রতিদিনই কাজের শেষে সন্ধেবেলা এই স্কুলশিক্ষকের বাড়িতে যেতেন এবং গল্পগুজব করে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতেন। একদিন এরকমই সন্ধেবেলা অরবিন্দবাবু সেই স্কুলশিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে দেখেন বাড়ির পরিবেশ বেশ থমথমে। স্কুলশিক্ষক কেমন যেন থম মেরে বসে আছেন। এমনকী, তার যে শিশুপুত্রটিকে রোজ খেলে বেড়াতে দেখা যায়, তাকেও দেখা যাচ্ছে না। অরবিন্দবাবুর মনে হলো— কিছু একটা বিপর্যয় ঘটেছে এই পরিবারে। উনি স্কুলশিক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন— কোনও অঘটন ঘটেছে কি আপনাদের বাড়িতে? আমি কি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে? শিক্ষক এসব কথার কোনও উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ এরকম কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ অরবিন্দবাবু শুনলেন বাড়ির বাইরে থেকে কারা যেন খুব উত্তেজিতভাবে ওই স্কুলশিক্ষকের নাম ধরে ডাকছে। তাদের ডাক শুনেই শিক্ষক খুব তড়িঘড়ি ভাবে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলেন। অরবিন্দবাবু জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখেন বেশ কিছু মাতব্বর গোছের লোক, তার ভিতর মৌলবি-ইমাম জাতীয়ও কয়েকজন রয়েছে, চোখ রাঙিয়ে ধমকধামক দিয়ে ওই শিক্ষককে যেন কী সব বলছে। মাতব্বর গোছের লোকেরা বেশ কিছুক্ষণ ধমকধামক দিয়ে চলে যাওয়ার পর ওই শিক্ষক ম্লানমুখে এসে ঘরে বসলেন। অরবিন্দবাবু এবার যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন— 'কোনও বিপদ হলে আপনি আমাকে বলুন। আমি একটি সরকারি সমীক্ষক দলের সদস্য হিসেবে এখানে এসেছি। দরকার হলে আমি পুলিশে খবর দেব।' এবার ওই শিক্ষক অরবিন্দবাবুর হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন— 'আপনি দয়া করে এখান থেকে চলে যান।' অরবিন্দবাবু বললেন— 'বেশ আমি চলে যাচ্ছি। তার আগে তো আমাকে বলুন কী হয়েছে।' ম্লান মুখে শিক্ষক বললেন— 'গতরাতে ওরা আমার বউকে তুলে নিয়ে গেছে।' অরবিন্দবাবু হতবাক। বললেন, 'আপনি

অনুপ্রবেশ সমস্যা রোধ করতে নাগরিক পঞ্জিকরণ এই রাজ্যে যেমন জরুরি, তেমনই যে অসহায় হিন্দুরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এই রাজ্যটিতে আশ্রয় নেন— তাদের স্বার্থ রক্ষিত করাও অতখানিই জরুরি। এই স্বার্থ রক্ষিত হবে তখনই, যদি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি সংসদে পাশ হয়।

পুলিশে জানাননি?' হতাশ কণ্ঠে শিক্ষক বললেন— 'বলে কোনও লাভ নেই। ওরা মাঝে মাঝেই এরকম তুলে নিয়ে যায়। আবার দু-তিনদিন পর ফেরত দিয়ে যায়। আমাদের এখানে যেসব হিন্দু পরিবারে কমবয়সি মেয়ে বউ আছে— তাদের সবাইকেই ওরা মাঝে মাঝে এরকম তুলে নিয়ে যায়।'

পূর্ণিমা শীল। বাংলাদেশের নবাবগঞ্জে বাড়ি ছিল। তেরো বছর বয়স। সদ্য কিশোরী। এই পূর্ণিমাদের বাড়িতে একদিন মাঝরাতে প্রতিবেশী মুসলমান যুবকরা হানা দিল। পূর্ণিমার বাবা-মাকে একটি ঘরে আটকে রেখে টেনেহিঁচড়ে পূর্ণিমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। পূর্ণিমার অসহায় মা ওই যুবকদের পায়ে ধরে মিনতি করেছিল— 'বাবা, আমার মেয়েটা বড্ড ছোট। ও বড় কষ্ট পাবে। তোমরা একসঙ্গে যেও না। একজন একজন করে যাও।' পৃথিবীর কোনও প্রান্তে কোনও অসহায় মা এরকম করুণ আর্তি করেছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। আমার ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। সে-ও তাঁর একটি অভিজ্ঞতা শুনিয়েছিল আমাকে। কয়েক বছর আগে কবি-সাহিত্যিকদের একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে বিনায়ক গিয়েছিল বাংলাদেশে। বাংলাদেশে থাকাকালীনই ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে বিনায়ক। সেই মতোই ঢাকার কলেজ ছাত্রী এক হিন্দু তরুণী একদিন বিনায়ককে ঢাকেশ্বরী মন্দির দর্শন করাতে নিয়ে যায়। মন্দিরে বিনায়ক পুজো দেয়। ওই তরুণীটিও পুজো দেয়। মন্দির থেকে বেরিয়ে বিনায়ক ঠাট্টাছলেই তরুণীটিকে জিজ্ঞেস করে— 'কী চাইলে ঠাকুরের কাছে? শিব ঠাকুরের মতো স্বামী?' তরুণটি উত্তর দিয়েছিল— 'না। ঠাকুরকে বললাম— আমাকে যেন কোনওদিন ধর্ষিতা হতে না হয়।' পৃথিবীর কোনও প্রান্তে কোনও তরুণী ঈশ্বরের কাছে এমন প্রার্থনা করেছেন বলেও আমার জানা নেই।

নিকারাগুয়ার জন্য এই কলকাতার রাস্তায় সুবিশাল পদযাত্রা হয়েছে। প্যালেস্টাইনের পাশে থাকার শপথ নিয়ে কলকাতার রাস্তা কাঁপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেনেজুয়েলায় বামপন্থীরা ক্ষমতায় এলে উদ্বেল হয়ে উঠেছে কলকাতা। শুধু দেশভাগের সময়কার পূর্বপাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের এই হতভাগ্য, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হিন্দুদের জন্য তাদের দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলার ফুরসত হয়নি। ফি বছর কলকাতা থেকে দল বেঁধে কবি-সাহিত্যিক-লেখকরা ঢাকার একুশে ফেব্রুয়ারির বই মেলায় যান। আমাদে-প্রমোদে ছুটি অতিবাহিত করে এসে এখানে 'একই বৃন্তে দুইটি কুসুম'-এর গল্প শুনিয়েছেন। শুধুমাত্র তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের এই অসহায় হিন্দুদের দুর্দশার কথা এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই ভুলে গিয়েছেন। অথচ সেই দেশভাগের সময় থেকেই ওপারের হতভাগ্য হিন্দুরা তাকিয়ে থেকেছে ভারতের দিকে। ভারতকেই তাদের নিরাপদ আশ্রয় মনে করেছে সেই দেশভাগ পর্ব থেকে নীরবে অত্যাচার সহ্য করে আসা এই মানুষগুলি। তাতে অবশ্য অন্যায়ও কিছু নেই। কারণ ধর্মের ভিত্তিতে এই দেশটি যেদিন ভাগ হয়ে গিয়েছিল, মুসলিম লিগ যেদিন ইসলামের দোহাই পেড়ে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেইদিনই, কেউ মানুক বা না মানুক, স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর আবাসভূমি ভারতবর্ষ। কাজেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নির্যাতিত হিন্দুরা যদি ভারতে নিরাপদে আশ্রয় খোঁজে তাতে অন্যায়ের কিছু নেই। সেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজেই সেই দেশভাগ পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের এই হতভাগ্য হিন্দুরা সীমানা পেরিয়ে এদেশে এসেছেন, আজও আসছেন। একথা সত্য কোনও বৈধ ভিসা পাশপোর্ট নিয়ে এরা এদেশে আসেননি। আসছেনও না। তবু, একথাও পাশাপাশি সত্য, এরা কেউই কিন্তু অনুপ্রবেশকারী নন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংজ্ঞা অনুযায়ীই এরা শরণার্থী। রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার শরণার্থী সংক্রান্ত সংজ্ঞায় বলেছে, কোনও ব্যক্তি বা কোনও গোষ্ঠী যদি ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে নিজ দেশে অত্যাচারিত হয় এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করে— তবে অবশ্যই তারা শরণার্থী। গত সাত দশক ধরে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় যে বাংলাদেশি হিন্দুরা এদেশে চলে এসেছেন— তাদের পাকাপাকি আশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারগুলি প্রায় কিছুই চিন্তা করেনি। বর্তমান সরকার সেই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাটি করেছে। চিন্তাটি করেই তারা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এনেছে। যে বিলটিতে বলা হয়েছে— পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে চলে আসা নির্যাতিত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈনদের এদেশে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে চলে আসা মানুষগুলির পাশে কেন্দ্র সরকার দাঁড়াতে চাইছে। দাঁড়াতে চাইছে না কংগ্রেস, বামপন্থী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। সংসদে এই বিলটিকে তারা সমর্থন জানাচ্ছে না। তাদের দাবি— মুসলমানদের কথাও এই বিলে উল্লেখ থাকতে হবে। মজার কথা, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মুসলমানরা শরণার্থীর পর্যায়ে পড়ছে না। কারণ, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাফ বলেছে, অত্যাচারিত হয়ে নয়, বরং অন্য কোনও উদ্দেশ্যে অবৈধ উপায়ে যারা অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় নিচ্ছে তারা অবশ্যই অনুপ্রবেশকারী। পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমানরা অত্যাচারিত হয়ে এদেশে ঢুকছেন না। তাদের অনেকেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েও এদেশে ঢুকছেন না। আর এখানেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য কেঁদে বুক ভাসানো কংগ্রেস, বামপন্থী আর মমতা বন্দ্যোপ্যাধায়ের দলের প্রকৃত চরিত্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় প্রচার চালাচ্ছে, বিজেপি বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদেরও তাড়িয়ে দেবে। অথচ প্রকৃতই যখন কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এনে বাংলাদেশ থেকে আগত এই হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টিকে পাকাপাকি করতে চাইছে— তখন তাকে সমর্থন না করে বাঙ্গালি হিন্দুর স্বার্থের বিরোধিতা করছে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলই। কাজেই শরণার্থী হয়ে আসা বাঙ্গালি হিন্দুকেও আজ চিনতে হবে— কে তাদের প্রকৃত বন্ধু, আর কোন তস্কর বন্ধুর বেশে তার ঘরে ঢুকতে চাইছে।

অনুপ্রবেশ সমস্যা রোধ করতে নাগরিক পঞ্জিকরণ এই রাজ্যে যেমন জরুরি, তেমনই যে অসহায় হিন্দুরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এই রাজ্যটিতে আশ্রয় নেন— তাদের স্বার্থ রক্ষিত করাও অতখানিই জরুরি। এই স্বার্থ রক্ষিত হবে তখনই, যদি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি সংসদে পাশ হয়। আর এই দাবি উঠে আসতে হবে শরণার্থী বাঙ্গালি হিন্দুদের কণ্ঠ থেকেই। ■

উনিশের নির্বাচন আসলে ভারতীয়ত্ব রক্ষার মহাসংগ্রাম

সাধন কুমার পাল

শিকাগো ধর্মসম্মেলনে যোগ দেওয়ার ঠিক এক বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ খেতরি নিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে একটা চিঠিতে লিখেছেন, 'এখন এই পাদরিরা দক্ষিণে কি করিতেছে, দেখিবেন— আসুন দেখি। তাঁহারা লাখ লাখ নীচ জাতকে খ্রিস্টান করিয়া ফেলিতেছে আর পৌরহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশি, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী এবং স্ত্রীলোকেরা এমনকী রাজবংশীয় মহিলাগণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণের উপপত্নী রূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তথাকার সিকিভাগ খ্রিস্টান হইয়া গিয়াছে।'

ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য ধর্মান্তরকরণের সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে কিছু রাজ্য যেমন তামিলনাড়ু, ওড়িশা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়ে এই সমস্যা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। সাধারণত কোনও এলাকার আর্থিক অবস্থা, সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরকরণের কাজ চালানো হয়। কিন্তু ৫০০ বছর আগে গোয়ায় ধর্মান্তরকরণের জন্যই ভয়ংকর নরসংহার সংগঠিত হয়েছে। আজকের দিনে হয়তো এই ভয়ঙ্কর ঘটনার সত্যতা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু ইতিহাস বলছে সেদিন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে ধর্মান্তরকরণের জন্য গণহত্যা চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে কচুকাটা করা হয়েছে। মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পুর্তুগিজ সেনার সাহায্যে সংগঠিত নরসংহারই নয়, সীমাহীন প্রতারণার সাহায্যও নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার মানুষের ধর্মান্তরকরণের জন্য। ধর্মান্তরকরণের এই পদ্ধতিকে 'ইনকোয়িজিশন' বলে অভিহিত করা হয়। যে সমস্ত দেশে পাঁচশো বছর ধরে ইউরোপিয় উপনিবেশ ক্রিয়াশীল ছিল, সেই সমস্ত দেশের সবগুলিতেই ইনকোয়িজিশনের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ কার্যকর করা হয়েছে। বিগত পাঁচশো বছর ধরে বিশ্বজুড়ে কয়েক হাজার ইনকোয়িজিশনের ঘটনা ঘটেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট দেশের ঔপনিবেশিক শাসনকে নিষ্কন্টক করার জন্য। তবে শুধু মাত্র ধর্মান্তরিত করেই যে রাষ্ট্রান্তরিত করা হচ্ছে এমন নয়। অনেক দেশে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে ধর্মান্তরিত পরে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রান্তরিত করা হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে তামিলনাড়ুর পরিস্থিতি উল্লেখ করা যেতে পারে। তামিলনাড়ুতে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলেও এই উদ্দেশ্যে লাগাতার কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। খ্রিস্টান মিশনারি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা তামিলনাড়ুকে এক খ্রিস্টধর্মাবলম্বী এলাকায় পরিণত করতে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করেছে সেগুলির এত সূক্ষ্মদিক আছে যে একমাত্র অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে দেখলেই সেই সমস্ত বিষয়ের গভীরতা স্পষ্ট হতে পারে। প্রথম দিকে বিভিন্ন পুস্তিকার মাধ্যমে এরকম বলা শুরু হয় যে দ্রাবিড়রা কয়েক হাজার বছর আগে পূর্ব হিন্দ মহাসাগরের পাড়ে অবস্থিত লেমুরিয়া নামক এক প্রদেশ থেকে এসেছে, যার এখন অস্তিত্ব নেই। এই প্রদেশ আফ্রিকার কৃষ্ণবংশীয় মানুষের নিবাসস্থল ছিল যারা জেনিসিসের নোহার অভিশপ্ত পুত্র হামের বংশজাত। ধীরে ধীরে এই আক্রমণের ধার বাড়তে থাকে। বলা শুরু হয় দক্ষিণ ভারতে বসবাসকারীরাই ভারতের প্রকৃত ভূমিপুত্র। এই ভূমিপুত্ররা মূলত ইউরোপ থেকে আফ্রিকার পথ ধরে আসা হমেটিক খ্রিস্টান। আর্যরা আক্রমণ করে ওদের ভারতের দক্ষিণ দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এগুলি সবই ভারত সম্পর্কে মূলগত ধারণা বদলে দেওয়ার কাজ। তামিলনাড়ুর এক আর্চবিশপ ডাঃ দেবনায়কম এ ব্যাপারে কিছু অভিনব বিষয় উত্থাপন করেন। যেমন ২০০০ সালে ডাঃ দেবনায়কমের উদ্যোগে 'দ্রাবিড় ধর্মই ভারতকে জাতিভেদ প্রথা থেকে মুক্ত করতে পারে' এরকম একটি শীর্ষক আলোচ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়। এর পরের বছর আরেকটি বিষয় তুলে ধরা হয় যার শীর্ষক ছিল 'ভারতই দ্রাবিড়-খ্রিস্টান স্থান'। এর পর ২০০৫ সালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতের শৈব-ইজম ও বৈষ্ণব-ইজম'। ২০০৬ সালের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'বিশ্বে দ্রাবিড়িয়-খ্রিস্ট মতবাদ তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা'। এর পরের বিষয় ছিল, 'ভারতে খ্রিস্টান ধর্মের দুই হাজার বছরের ইতিহাস'। ২০০৮ সালের বিষয় ছিল 'দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য, কলা উপাসনা, মূর্তিকলা নৃত্যশৈলীর উপর দ্রাবিড়িয় খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব'।

বিভিন্ন গবেষণার মোড়কে এটা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হচ্ছে যে, সংস্কৃত ভাষা সেন্ট থমাস ইউরোপ থেকে ভারতে এনেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য সেন্ট থমাস ভারতে আসার পর রচিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা মূলত গ্রিক

দিল্লীর আর্চবিশপ থমাস কুটো।

ল্যাটিন ভাষা থেকে বিকাশ লাভ করছে। এই সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই ভারতে উচ্চতম ধর্মীয় ভাবনার জন্ম হয়েছে, কিন্তু আদি শঙ্করাচার্য এই ভাষাকে বিকৃত করে এর মধ্যে জাতি বিভেদের বিষয়বস্তু প্রবেশ করিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতে সেন্ট থমাসের মাধ্যমেই উচ্চতম ধর্মীয় ভাবনা প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের চতুর হিন্দু ব্রাহ্মণরা এর মধ্যে উঁচুজাত, নীচুজাত, ছুঁয়াছুঁতের ধারণা প্রবেশ করিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের মানুষ আফ্রিকা থেকে এসেছে, সেজন্যই স্বাভাবিক ভাবেই ওদের গায়ের রঙ কালো। গায়ের রঙ কালো বলেই আর্য ব্রাহ্মণরা ওদের উত্তর ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কালো মানুষদের প্রতি এই ছুঁয়াছুঁত ঘৃণার ভাবনা যাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেই জন্য শঙ্করাচার্য ভারতের চারদিকে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। এই মঠ যেহেতু অস্পৃশ্যতা প্রসারের সহায়ক সেজন্য এইগুলিকে শীঘ্রই ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আবার আর্য ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব যারা কিনা আগে খ্রিস্টান ছিল তাদেরও কব্জা করে নিয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য নিজেদের ভাষায় রূপান্তরিত করে নয়ের শতকে স্থাপিত চার মঠের দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল।

দেবকলা নামে এক মিশনারি ‘থমাস, দ্রাবিড়, ইসাই দেশ’ নামে চারশো পৃষ্ঠার একটি বই লিখেছেন। এই পুস্তকে বলা হয়েছে ধূর্ত আর্য ব্রাহ্মণরা ওই সময়ের প্রভাবশালী সাদাসিধে দ্রাবিড়দের সামনে অত্যন্ত সম্মোহক নেশা ধরে যাওয়ার মতো আদর্শ, সুন্দর মহিলাদের সাহায্যে আকর্ষিত করে নিজেদের দর্শন চাপিয়ে দিয়েছে। খ্রিস্টান দর্শনের ভক্তিমার্গ থেকে আসা পরমেশ্বরের ধারণা ‘অহম্ ব্রহ্মাস্মি’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ পরমেশ্বর আমার নিজের মধ্যে আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য বিষয়টি ভুল ব্যাখ্যা করে এর অর্থ করেছেন ‘আমিই ঈশ্বর’। এই বইয়ে পরে বলা হয়েছে সেন্ট থমাসের অনুগামীরা নিজেদের মতবাদ প্রচারের জন্য সংস্কৃত ভাষা তৈরি করেছেন।

খুব সংক্ষেপে বললে বলতে হবে, খ্রিস্টান মিশনারিরা কিছু ভয়ংকর কাল্পনিক মিথ্যাচারের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে ভারতবর্ষের ভিতটাকে নাড়িয়ে দেওয়ার কোনও প্রয়াসই বাদ দিচ্ছে না।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে ছয়টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারত সম্পর্কিত এই ধরনের মিথ্যাচার আসলে ভারতকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে খ্রিস্টান মিশনারিদের কয়েক শতাব্দী চলে আসা প্রয়াসের ফসল। কোনও বিষয় যখন বিশ্বের কুটনীতিবিদদের সামনে তুলে ধরা হয় তখন সেটি বিশদ ভাবে তুলে ধরতে হয়। কূটনীতিকদের এই সমস্ত বিষয়ের সত্যাসত্য পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইয়ের সময় না হলেও যাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলে একটি ধারণা গড়ে ওঠে। তামিলদের সমস্যা তুলে ধরার ছুঁতোয় ভারত সম্পর্কে পরিকল্পিত মিথ্যাচার শুরু করা হয়। তামিলরা আর্য ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের শিকার এই বিষয়টি গ্লোবাল ইস্যু করে তোলার সমস্ত রকম প্রয়াস হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে দ্রাবিড় সংস্কৃতির জন্ম সেন্ট থমাসের ভাবনা থেকে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পরে সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের সেমিনার আয়োজিত হতে থাকে। প্রত্যেকটি বিষয় সুপরিকল্পিত ভাবে তুলে ধরার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরের এক একটি সংস্থা গড়ে তোলা হয়। দ্রাবিড়রা যাতে বিদ্রোহ করে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব তৈরির জন্য পথে নামে তার জন্য সমস্ত রকম প্ররোচনাও দেওয়া হতে থাকে।

এই বিষয় নিয়ে এখন পর্যন্ত যে বড় ধরনের আন্দোলনের জন্ম হয়েছে সেরকম নয়। তবে এই ধরনের আন্দোলন তৈরি করার জন্য ধারাবাহিক প্রয়াস চলছে। ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশে তামিলদের পৃথক জাতিসত্তা তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের বিষয় নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্ট্যাডিজ দ্রাবিড়িয়ান স্পিরিচুয়াল মুভমেন্টের মতো সংস্থা ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশে পাওয়া যাবে। অনুকূল পরিবেশ পেলেই এই সমস্ত সংগঠন যে কোনও সময় যে সক্রিয় হয়ে উঠবে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সমস্ত সংগঠনকে ওদের ভাষায় কীভাবে জবাব দেওয়া যায় সেই বিষয়টিও ভাবনা চিন্তা হওয়া জরুরি।

ভারতে পোপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাথলিকদের ক্রিয়াকলাপের শেকড় অনেক গভীরে। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন পোপ জন পল দ্বিতীয় ঘোষণা করেছিলেন আগামী শতাব্দীর সমস্ত প্রয়াস এশিয়াকে কেন্দ্র করে হবে। এবং এর শুরু আগামী একশত বছর ধরে ভারতকে খ্রিস্টানীকরণের মধ্য দিয়ে হবে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের দেশের গ্রাম বস্তি পাহাড় জঙ্গল সর্বত্রই এই ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ওদের এই প্রয়াসের ফলও পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভারতের গরিবি, বেকারি, নিরক্ষরতার অন্ধকারে ধুঁকতে থাকা এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে মিশনারিরা একশো ভাগ ধর্মান্তরকরণ করতে সমর্থ হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রটেস্টান্টরাও পিছিয়ে নেই। উত্তরপূর্ব ভারতে প্রটেস্টান্ট পন্থী ব্যাপটিস্ট চার্চের মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রান্তরণের কাজ ব্যাপক ভাবে চালানো হয়েছে। এর ফল স্বরূপ নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুরের মতো উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো রাষ্ট্র বিরোধী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে।

ড. রাজীব মালহোত্রা ও অরবিন্দন নীলকন্দনের ‘ব্রেকিং ইন্ডিয়া’ পুস্তকে ভারতে প্রটেস্টেটান্ট পন্থী লুথেরান চার্চের কাজকর্ম নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ভারতে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই চার্চের তরফে ‘গুরুকুল’ শীর্ষক বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। এই সংস্থা কয়েক বছর আগে ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস নামে বিশ্বস্তরের সংগঠনে দলিত সমস্যা তুলে ধরেছিল। এই সংস্থার মতে দলিতদের ধর্মান্তরিত করে পৃথক দলিত স্থান বানানোই ভারতে দলিত সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ। বিগত তিনশো বছর ধরে লুথেরান পন্থীরা ভারতে অত্যন্ত আক্রমনাত্মক ভাবে ধর্মান্তরকরণের কাজে সক্রিয়। এদের কার্যক্ষেত্র মূলত তামিলনাডু এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি। মহাত্মা গান্ধীও লুথেরান পন্থীদের ধর্মান্তরকরণ না করার আবেদন করেছিলেন। গান্ধীজীর এই আহ্বান দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল। এমনকী কিছু খ্রিস্টান সংগঠনও গান্ধীজীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু লুথেরান চার্চের তৎকালীন বিশপ সন্ডেগ্রেন গান্ধীজীর

এই আহ্বান শুধু নস্যাৎ করেনি, সেই সঙ্গে সমালোচনা করে বলেছিলেন গান্ধীজীর ধর্মান্তরকরণ বিরোধী অবস্থান সমগ্র পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। ড. বি আর আম্বেদকরও ওই সময় অস্পৃশ্যতা বিরোধী অভিযান চালাচ্ছিলেন। এই অভিযান নিয়েও লুথেরান চার্চ নাকারাত্মক ভূমিকা নিয়েছিল। কারণ ওদের ভয় ছিল অস্পৃশ্যতার মতো কুপ্রথা বন্ধ হয়ে গেলে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ হয়ে যাবে। ১৭০৬ সাল থেকে লুথেরান চার্চ ভারতে প্রথম কাজ করতে শুরু করে। সমস্ত ইউরোপ বিশেষ করে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারত বিরোধী অভিযান চলানোর বিষয়ে এই সংস্থা সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতে ক্রিয়াশীল সমস্ত ভারত বিরোধী শক্তিকে এক মঞ্চে নিয়ে আসার জন্য এই সংস্থা সদা ক্রিয়াশীল। ইউরোপ এবং আমেরিকার বড় বড় সংস্থা থেকে ভারতের লুথেরান পন্থীরা নিয়মিত বেশ বড় রকমের আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে।

'ঘর ওয়াপসি' অর্থাৎ 'ঘরে ফেরা' শব্দ শুনলেই এক শ্রেণীর মিডিয়া ও রাজনৈতিক নেতা রে রে করে উঠেন। পৃথিবীর এমন ৫০-৬০টি দেশ আছে যেখানে এই ধরনের শব্দ উচ্চারণ করা পর্যন্ত সম্ভব নয়। কারণ এই সমস্ত দেশে ১০০ শতাংশ ধর্মান্তরকরণ সেই সঙ্গে ১০০ শতাংশ রাষ্ট্রান্তরকরণ হয়ে গিয়েছে। নিজস্ব সত্তা মুছে যাওয়ার পর কিন্তু ওই সমস্ত দেশের আর্থ সামাজিক ও মানবিক সমস্যাগুলি এতটুকু লাঘব হয়নি। উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে পঁচিশ বছর আগে ক্ষমতার অলিন্দে একজনও কৃষ্ণবংশীয় মানুষের উপস্থিতি ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু একজন খ্রিস্টান ধর্মগুরু হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের নামে ইউরোপিয়ান দখলদারীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কয়েক শতাব্দী আগে আমাদের আফ্রিকায় যখন খ্রিস্টান মিশনারিরা আসে তখন তাদের হাতে বাইবেল ছিল এবং আফ্রিকার এই বিশাল ভূমিতে ওরা নিশ্চিন্তে বসবাস করছিল। ওই মিশনারিরা আমাদের হাতে বাইবেল দিয়েছে আর আমাদের চোখ বন্ধ করতে বলেছে। এই মহাদ্বীপের কোটি কোটি মানুষ ওদের উপর ভরসা রেখে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু যখন চোখ খোলা হলো তখন দেখা গেল আমাদের হাতে শুধু বাইবেলটিই রয়েছে বাকি সমস্ত কিছু ওদের হাতে চলে গিয়েছে।' এটি শুধু আর্চবিশপ টুটুর বক্তব্য নয়, প্রত্যেকটি আফ্রিকি নাগরিকের এটাই অনুভব।

২০০ বছরের শাসনে ইউরোপিয়ানরা নির্বিচার লুটপাট চালিয়েই থেমে থাকেনি, ভ্যাটিকানের সহায়তায় সমস্ত ভারতকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও মিশনারিদের সেই কাজের ধারা অবাধে চলেছে। মিশনারিদের এই কুৎসিত মিশনের পেছনে অর্থ ভাণ্ডার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশি বিদেশি এনজিওগুলি কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সমর্থনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই দেশ বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ এই ধর্মান্তরিত মানুষগুলি এদের ভোটব্যাঙ্ক হয়ে ভোটের বাজারে স্থায়ী আমানত হিসেবে গণ্য হচ্ছে। জাতপাতের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করে ধর্মান্তরিত করাই মিশনারিদের মূল লক্ষ্য। সমস্ত ভারতকে ধর্মান্তরিত করার জন্য ১৯৯৫ সালে 'জশুয়া প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে। হিন্দু সমাজ থেকে লিঙ্গায়েতদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য কংগ্রেস সরকারের তরফে কর্ণাটক বিধানসভায় যে প্রস্তাব পাশ করার বিষয়টি এই প্রজেক্টের বড় সাফল্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। খ্রিস্টান মিশনারিদের অদৃশ্য হস্তের ইশারাতেই যে তামিলনাড়ুর প্রাচীন প্রথা জলিকাট্টু, কেরলের শবরীমালা মন্দির নিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে এটা আজ প্রমাণিত। ২০১২ সালে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভারতের সর্বত্র কাজ করার জন্য 'নো অবজেকশন' সহ 'মিশনারি ভিসার' ব্যবস্থা করে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার গণধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করেছিল।

মিশনারিদের পক্ষ থেকে দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির মদতপুষ্ট সমস্ত খ্রিস্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও চার্চগুলিকে উনিশের নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিল্লির আর্চবিশপ অনিল জে টি কিউটো সমস্ত খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠি ফাঁস হয়ে যাওয়াতেই চার্চের এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে আসে। এই চিঠিতে স্পষ্ট করে ২০১৯ পর্যন্ত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সমস্ত মানুষকে প্রতি শুক্রবার চার্চে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হচ্ছে 'As we look forward towards 2019 when we will have a new government, let us begin a prayer campaign for our country.' গুজরাট বিধান সভা নির্বাচনেও চার্চের পক্ষ থেকে খ্রিস্টান মিশনারিদের নরেন্দ্র মোদী ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাক দেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একটি সংবাদ বলছে পাকিস্তানের মৌলভিরাও ভারতীয় মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নরেন্দ্র মোদীকে পরাজিত করে কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। আবার কাশ্মীর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও বলেছেন উনিশে নতুন সরকার গঠনের পরই ভারতের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করবেন।

কয়েক শতাব্দী ধরে ধারাবাহিক ভাবে খ্রিস্টান মিশনারিরা ছলে বলে কৌশলে ভারতে ধর্মান্তরকরণ সেই সঙ্গে রাষ্ট্রান্তরকরণের কাজে সক্রিয়। খ্রিস্টান মিশনারিদের আঁতুড়ঘর আমেরিকায় আয়োজিত ধর্ম মহাসম্মেলনে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর দেওয়া বলিষ্ঠ বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে সে সময়েই তিনি এদেশে মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের আগ্রাসন সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করার জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন। মিশনারিদের নিয়ে স্বামীজীর সাবধান বাণীর ১২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সেই আগ্রাসন বন্ধ হওয়া তো দুরের কথা এর প্রাবল্য আরও বেড়েছে।

স্বাধীন ভারতে ভোট ভিখারি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিও মিশনারিদের প্রত্যক্ষ সহায়তার নিরিখে সেই ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমিকা পালন করছে। সেইজন্যই হয়তো আজ পর্যন্ত ধর্মান্তরকরণ বিরোধী কঠোর আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়নি। এটি একটি অশনি সংকেত। ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ ছাড়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা পৃথিবীর মহাশক্তিগুলির মদতপুষ্ট খ্রিস্টান মিশনারিদের এই আগ্রাসন বন্ধ করা সম্ভব নয়। ■

হিন্দুরা কি শুধু ঘুমিয়েই থাকবে?

ডাঃ আর. এন. দাস

শুধু খণ্ডিত ভারতের হিন্দুরাই নয়, সারাবিশ্বের মানুষ আজ এক ভীষণ তাণ্ডবের শিকার হতে বাধ্য হচ্ছেন। আর তা হচ্ছে ইসলামিক জিহাদ। প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ ড. বিল. ওয়ার্নারের মতে, গত ১৪০০ বছর ধরে বিধ্বংসী ইসলামিক জিহাদের আগুনে কমপক্ষে ২৭০ মিলিয়ন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন এমনকী মুসলমানদের মধ্যেও অনেক গোষ্ঠী যেমন শিয়া বা আহমদিয়ারা আছেন যারা নাকি খাঁটি মুসলমান নন, তাদেরও মেরে ফেলা হয়েছে নির্দয় ভাবে কোরানের বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে।

যেখানেই মুসলমানরা গেছে সেখানেই তারা কোরানকে অবলম্বন করে 'দার-উল-হারাবকে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করেছে নানা প্রকার ছল-চাতুরি ও তরবারির সাহায্যে। ভাবুন তো, একসঙ্গে ৩/৪ জন মিলে অন্যধর্মের একটি অসহায় মেয়েকে ধর্ষণ করছে আর তার সামনে কোরানের বাণী পড়ে শোনাচ্ছে। আর এটাই হবে নাকি ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীর জন্য একমাত্র ধর্ম! আজকের মধ্য-এশিয়ার দেশগুলি একদিন ইহুদি আর খ্রিস্টানদের বাসভূমি ছিল। কিন্তু আজ তার আর কোনও চিহ্ন নেই। আজকের মিশর আর ইরাক ছিল প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার প্রতীক। আজকে তার আর কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আফগানিস্তান মাত্র ৮০০ বছর আগেও ভারতের মধ্যে ছিল, যা ছিল গান্ধারীর জন্মভূমি। গান্ধার আজ কান্দাহার হয়েছে। পাকিস্তান আর বাংলাদেশ মাত্র ৭২ বছর আগে ছিল ভারতের অখণ্ড অঙ্গ। কিন্তু কী হচ্ছে? কে করছে এসব? আমরা জেনে শুনেও, অসহায় হয়ে চুপ করে বসে আছি কেন? গত ৮০০ বছরের মধ্যযুগীয় বর্বর মুসলমান আক্রমণে ২০ কোটি হিন্দু- শিখের আত্ম-বিসর্জন এবং ২০০ বছরের ব্রিটিশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে ৭ লক্ষ ৩২ হাজার শহিদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে রক্তাক্ত ইন্ডিয়াকে (ভারত নয়) পেয়ে হিন্দুরা ভেবেছিল এবার বুঝি তারা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আর নেহেরুর ভ্রষ্টনীতির কারণে হিন্দুরা আজ নিজ দেশেই পরবাসী হতে বসেছে! কে বলেছে মুসলমান আর খ্রিস্টানদের থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে? বরং তারা আরও বেশি হিংস্র ও শক্তিশালী হয়েছে এবং গোদের উপর বিষফোড়া গজিয়েছে তথাকথিত কুখ্যাত কমিউনিস্টের দল। ইসলামিক পাকিস্তান আর বাংলাদেশের বিনিময়ে প্রাপ্ত ভারতকে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ রাখতে হয়েছে যাতে করে সরকারি অনুদানে অবশিষ্ট হিন্দুদের সহজেই ধর্মান্তরিত করে ইসলামিক ইতিহাসের অসম্পূর্ণ অধ্যায় 'গাজওয়া-ই- হিন্দ' মতবাদকে বাস্তবায়িত করা যায়। যার ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে তথাকথিত সংবিধান, গণতন্ত্র আর সেকুলারিজমের অন্তরাল থেকে ব্যাপক হারে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হতে হয়েছে। আজ ভারতের ৮ প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু!

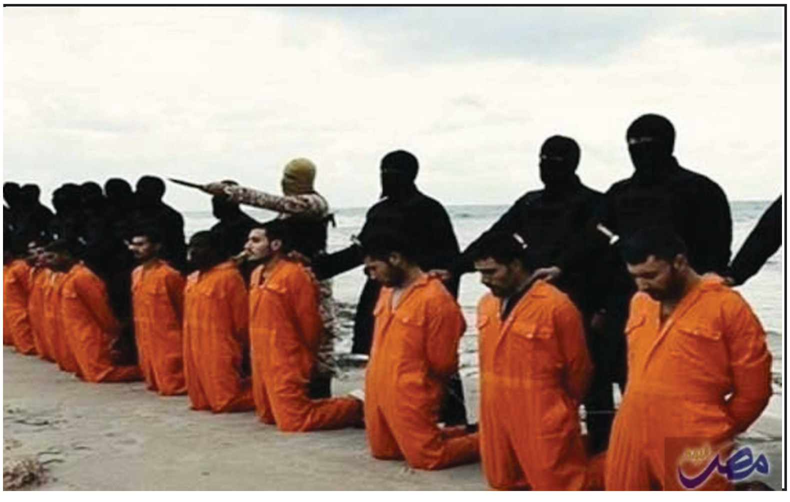

ইরাকে জেহাদিদের গণহত্যা।

মাইনো আন্টনিয়ো সোনিয়ার কংগ্রেস পার্টি, মাও এবং মার্কসের অনুগামী কমিউনিস্টরা ভ্রষ্ট ও লোভী সংখ্যালঘু ভোটের ভিখারি আঞ্চলিক দলগুলির রাজনেতারা অর্থাৎ মায়া, মমতা, মুলায়ম, নাইডু এবং মৌলভি, মিশনারি, তথাকথিত সদা-সর্বক্ষণ-সত্যের সন্ধানী সাংবাদিক আর তাদের পদলেহী আমলারা গত ৭০ বছর ধরে খণ্ডিত ভারতকে লুঠ করে চলেছে ৮টি আরব-রাষ্ট্র আর ভ্যাটিকেনের পোপের প্রত্যক্ষ নির্দেশে। জানেন কতো? প্রায় ৫২ লক্ষ কোটি টাকা!

মুসলমানদের উদ্দেশ্য কী?

১. জনবিন্যাসের অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যাতে করে সারা ভারতের প্রতিটি প্রদেশে, শহরে, গ্রামে ও অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাধিক্য ঘটে। প্রায়ই দেখা যায় মৌলভিরা খোলা ময়দানে হিন্দুদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, তারা অ্যাটম বোমের সাহায্যে নয়, জন-বিস্ফোরণের মাধ্যমে হিন্দুস্থান জয় করে নেবে। নাবালিকা মেয়েদের বিয়ে করতে বাধ্য করছে। একাধিক বিয়ে করছে। লিবিয়ার কুখ্যাত শাসক কর্নেল মুয়াম্মার গদ্দাফি সেটাই বলেছিল আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানকে ১৯৮৬ সালে লিবিয়ার উপর বোমাবর্ষণের উত্তরে। লোকসভা বা বিধানসভা ভোটের মাধ্যমে ২৫ শতাংশ মুসলমান এমপি, এমএলএ আর এমএলসি-র সাহায্যে বিনা রক্তপাতে সরকারি আইনের দ্বারা ভারতকে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করবে। আজ এই পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি আসনের মধ্যে হিন্দু সাংসদের স্থানগুলিতে নির্বাচিত হয়েছেন ৮-৯ জন মুসলমান সাংসদ। তারা সকলেই কোরানের মাস্টার! তাই প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ তারপর গোটা ভারতেই মুসলমান

রাজত্ব চলবে। সেদিন আর দূর নেই। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

২. **হিন্দুস্থানে শুধু হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে** আতঙ্কিত করে রাখা বিভিন্ন জিহাদি সংগঠনের মাধ্যমে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আই এস আই-এর সঙ্গে সম্পর্কিত মুসলমান সংগঠনগুলি যেমন সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, ইসলামিক গার্লস স্টুডেন্টস অর্গানাইজেসন ইত্যাদি ভারতের প্রতিটি শহরে সকলের অলক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। 'লাভ জিহাদ' হচ্ছে মুসলমানদের এক জঘন্যতম 'তাকিয়া'। ধর্মান্তরিত হিন্দু মেয়েদের পাঠিয়ে দিচ্ছে সিরিয়ায় আত্মঘাতী বোমার শিকার হরার জন্য। কেরালা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গেও এর অনেক উদাহরণ আছে, কিন্তু সাংবাদিকরা ভয়ে এবং অর্থের লোভে সেসব কথা প্রকাশ করেন না।

৩. **সমানে আর্থিক, সামরিক ও লজিস্টিক সাহায্য** দিয়ে চলেছে চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছাড়াও অনেক ইসলামিক রাষ্ট্র। নৈতিক ও ধর্মীয় সমর্থন পাচ্ছে হাদিস আর কোরানের বাণী থেকে। সর্বোপরি, পরোক্ষ সাহায্য পাচ্ছে দেশের মধ্যেই পালিত লোভী আর ভ্রষ্ট আমলা ও রাজনেতাদের কাছ থেকে। তারা রেশন, প্যান আর আধার-কার্ড ও পাসপোর্টের সাহায্যে ভারতের নাগরিকত্ব পাইয়ে দিচ্ছেন। যে কোনও পাশপোর্ট অফিসে যান, মিলিয়ে নিতে পারবেন। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং বার্মা থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের আমদানি করছে শুধুমাত্র হিন্দুদের উপর আধিপত্য করার জন্য। দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে, কেরলে, জম্মুতে, হিমাচলে, উত্তরাখণ্ডে মুসলমান জনসংখ্যা কী অবিশ্বাস্য গতিতে বেড়ে গেছে। মথুরা, বৃন্দাবন এবং হরিদ্বারের মতো হিন্দু তীর্থস্থানগুলিতে কীভাবে মুসলমান সংখ্যা বাড়ানোর অভিযান শুরু হয়েছে। আমি যেখানে কাজ করি সেখানে কিরঘিজস্থান, মালদ্বীপ আর আফগানিস্তানের মুসলমানরা নির্বিবাদে কাজ করে যাচ্ছে হিন্দুদের উপর আধিপত্য বজায় রেখেই।

৪. **মাদ্রাসাগুলির ব্যাপারে** প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু ঠিকই বলেছিলেন, 'জিহাদিদের আঁতুড় ঘর'। এর প্রমাণ পাবেন, বাংলাদেশ লাগোয়া দুই ২৪ পরগনা, নদীয়া, দুই দিনাজপুর আর কুচবিহারের সীমান্তে গেলে। কীভাবে রাত্রের অন্ধকারে গোরু, কেরোসিন, টাকা, মেয়ে এবং ওষুধের খোলা কারবার চলে। বিএসএফ-এর জওয়ানরা কিচ্ছু করতে পারেন না, কারণ মৃত্যুভয় আর শাসকদলের চাপের কাছে নতি স্বীকার। দেশের প্রতিটি মাদ্রাসাতে পাওয়া যাচ্ছে, 'ক্যাশ আর কলশ্‌নিকভ' যা ব্যবহার হবে 'লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থানের' যুদ্ধে। প্রতিটি কোরান পড়া শিক্ষিত মুসলমান হচ্ছে হিন্দুর শত্রু। রাতারাতি নেহরু-গান্ধীর ষড়যন্ত্রে ১৯৪৭ সালে দেশের এক-তৃতীয়াংশ জোর করে কেটে নিল হাসতে হাসতে। আর আজ গোটা ভারতকে নিয়ে নিতে চাইছে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলো আর আজ পাকিস্তানের চেয়ে ভারতে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। কে এর জন্য দায়ী? বলে দিতে হবে? আর আমরা সব জেনে শুনেও হিন্দুনামধারী মুসলমান রাজনেতাগুলোকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনছি নিজেদের মা-বোনের ইজ্জত লুট করানোর জন্য আর বিদেশি-আক্রান্তদের দাসত্ব করার জন্য! এইজন্যই তো হিন্দুরা খুব ভালো!

> **মাত্র ৪ বছরে মোদী যদি এত বিরোধিতার বেড়ি পায়ে লাগিয়েও খণ্ডিত আর রক্তাক্ত ভারতকে তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম আর নিরন্তর পরিশ্রমে বিশ্বের চতুর্থ মহাশক্তিধর দেশে পরিণত করতে পারেন, তবে আমরাও কেন তাঁর সঙ্গে যোগদান করবো না আমাদের দেশকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে?**

৫. **সংরক্ষণ :** মুসলমানরা এখন দাবি করছে সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত বিভাগে সংখ্যা অনুপাতে মুসলমানদের কোটা দিতে হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকী পার্লামেন্টে, কোর্টে, থানায়, সৈন্য বিভাগে তাদেরকে রাখতেই হবে। প্রথমে দাবি, পরে জোর করে আদায় করে নেওয়া। তারা অনেকেই কিন্তু ছদ্মনামে কাজ করে চলেছেন অজান্তে। তৃণমূলের সাংসদ, ইমরান হাসান, বাংলাদেশি কিন্তু ভারতের পার্লামেন্টে বসে শরিয়া আইন মাফিক কাজ করে চলেছেন। মমতার ডান হাত, এই সেই ফিরাদ হাকিম পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকার সাংবাদিক মালিহা সিদ্দিকিকে দেখাতে চেয়েছিলেন, তার নির্বাচনক্ষেত্রটি কেমন একটি 'মিনি পাকিস্তান' হয়ে উঠেছে, কেননা সমস্ত রাস্তার নামই লেখা আছে উর্দুতে। তিনিই আজ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের দ্বিখণ্ডিত বাংলায় কলকাতা শহরের প্রথম মুসলমান মেয়র হলেন, যে আসন অলংকৃত করেছিলেন স্বনামধন্য ডাঃ বিধান রায় আর প্রফুল্ল ঘোষ। মনে করিয়ে দিচ্ছি, ১৯৪৬ সালের 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর নায়কের নাম, 'ওসমান'। তিনিই ছিলেন কলকাতার শেষ মুসলমান মেয়র। পাকিস্তানের মূলনিবাসী সাদিক খান এখন লন্ডনের মেয়র হয়েছেন। ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান সাজিদ জাহিদের উদাহরণও সবাই জানেন। জানেন কি, ব্রিটেনে মাত্র ৪ শতাংশ মুসলমান আছে কিন্তু তাতেই ১৬টা শহরের মেয়র মুসলমান?

৬. **মুসলমান তুষ্টিকরণ :** ভোটের ভিখারি রাজনেতারা দেশকে ভাগ করেছে এখন ভোটব্যাঙ্কের জন্য 'সংখ্যালঘু মঞ্চ' গঠন করে, মুসলমানদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে, দেশকে ইসলামিক দেশ বানানোর চেষ্টায় নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কে কতটা সংখ্যালঘুর হিতৈষী। কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ! একই অপরাধের জন্য 'হিন্দুর জন্য জেল আর মুসলমানের জন্য হলো খেল'। একই ক্লাসে হিন্দুর ছেলে-মেয়েরা চেয়ে থাকবে আর

মুসলমানের ছেলে-মেয়েরা পাবে ছাত্রবৃত্তি আর ফ্রি-কোচিং। মাদ্রাসায় পড়া ছেলেদের মূল্যাঙ্কন হবে সিবিএসসি কোর্সের ছেলেদের সঙ্গে। বিদ্যালয়ে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়ানো চলবে না, কিন্তু কোরান-বাইবেল হিন্দুদেরও পড়তে হবে। উর্দু অ্যাকাডেমি হবে কিন্তু সংস্কৃতের টোল উঠিয়ে দিতে হবে। সরস্বতী শিশু মন্দির বন্ধ হবে কিন্তু ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠবে মাদ্রাসা। দেখুন তো, কটা মন্দির আছে হিন্দুদের জন্য? আর পাড়ায় পাড়ায় মসজিদের ছড়াছড়ি! ইমামদের মাসিক ৫ থেকে বাড়িয়ে ৮ হাজার সরকারি মাইনে করতে হবে। মুয়াজ্জিমরা পাবে, 'হিন্দুরা কাফের আর আল্লা ছাড়া অন্য কোনও ভগবান নাই', দিনে ৫ বার, এই 'আজান' শোনানোর জন্য মাসিক বেতন ৩-৬ হাজার টাকা। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের পকেট থেকে কেটে দিতে হবে। সব রাজনেতাই 'হজ টাওয়ার' বানানোর প্রতিযোগিতা করেছে প্রতিটি প্রদেশে। আর হিন্দু শুধু মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে।

৭. **সন্ত্রাসের শাসন :** প্রতিটি প্রদেশের শহরে গ্রামে আজ তৈরি হয়ে আছে গুপ্ত জিহাদি ফৌজ। দেখেছেন তো, ট্রেনে বাসে দল বেঁধে কীভাবে ১০ থেকে ২৫ বছরের মুসলমান যাদের মাথায় 'ফেজটুপি আর ছাগলদাড়ি' রাখা আছে, সেইসব নব্য 'আনসারদের' অজানা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় কীসের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য? রেডরোডে রাস্তা বন্ধ করে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যটা কী? 'মেটিয়া বুরুজ' আর 'রাজা বাজারের' মতো মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় পুলিশ পর্যন্ত যেতে ভয় পায় কেন? হিন্দু মেয়ের রোজ গণ-ধর্ষণ হয়, শুনেছেন কি কোনও মুসলমান মেয়ের সেরকম হতে? আজ আপনি হিন্দু হয়েও মুসলমানদের পা-চাটা আধুনিক যুগের 'জয়চাঁদদের' হাত শক্ত করছেন, তাদের ভোট দিয়ে, মিটিং মিছিলে শামিল হয়ে, তাই নয় কি?

৮. **সংবাদ মাধ্যম :** কট্টর হিন্দু বিরোধী আর ততোধিক মুসলমান তোষণকারি বরখা দত্, রাবিশ কুমার, করণ থাপার আর পুণ্যপ্রসূণের মতো সাংবাদিকরা তাদের মাসিক বেতন তালিকায় থাকে। আর আমরা বোকা হিন্দুরা সেই সব টিভি চ্যানেলগুলি গিলি আর সংবাদপত্রগুলি পরীক্ষার পড়ার মতো মুখস্ত করি। স্বস্তিকায় আমার এ লেখাটা আশা করি না কেউ উৎসাহের সঙ্গে পড়বেন! কেননা এটা একান্তই হিন্দুদের নিজস্ব পত্রিকা। আনন্দবাজার, প্রতিদিন, জাগোবাংলা, গণশক্তি আর কলম পড়ুন খুব করে! জানেন কি 'কলমের' সম্পাদক একজন কট্টর হিন্দুবিরোধী বাংলাদেশি মুসলমান যিনি পশ্চিমবঙ্গের অধুনা নিষিদ্ধ সিমির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

৯. **আইন, আইনজ্ঞ, কোর্ট, কাছারি সবস্থানেই মুসলমান অথবা হিন্দু নামধারী মুসলমান :** আফজল গুরুর জন্য রাত বারোটায় সুপ্রিমকোর্ট খুলেছে, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৭০ জনের বেশি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে অথচ সুপ্রিমকোর্ট নির্বিকার, মোদীকে মারার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়া ৫ জন আসামির জন্য মধ্যরাত্রে নামিদামি উকিলরা জামিনের ব্যবস্থা করে এবং গৃহবন্দি করে রাখার বিশেষ সুবিধা আদায় করে দেয়! অযোধ্যা মামলা গত ৫০ বছর ধরে চলছে কিন্তু কেউ কোনও ফয়সলা করতে পারছে না। হিন্দুর 'শবরীমালা'র ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু মুসলমানদের 'তিন-তালাকে'র সিদ্ধান্ত দূর অস্ত। কপিল সিব্বল, মনুসিংভি, বহুচর্চিত বিচারক চেলমেশ্বর আর রঞ্জন গগৈয়ের মতো লোকের কাছে হিন্দুরা কি কোনও নিরপেক্ষ বিচার আশা করতে পারে?

সমাধান : সমস্যা যেমন আছে, তার সমাধানও ভগবান আমাদের দিয়ে রেখেছেন।

১. শত্রুদের চিনে নিন। কারা তারা? তারা হলো : মায়া-মমতা- মুলায়মের মতো লোভী ভ্রষ্ট নেতারা। একমাত্র নরেন্দ্র মোদী আর যোগী আদিত্যনাথের বিজেপিই হিন্দুর জন্য কিছু করবে। বাদবাকি সব সংখ্যালঘু ভোটের ভিখারি। তাই সিপিএম আর কংগ্রেস-সহ অন্য সব স্থানীয় আঞ্চলিক দলগুলিকে বয়কট করুন।

২. আজই স্থানীয় আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল, জন জাগৃতি সমিতি, সনাতন ভারত বা বিজেপির অফিসে এসে যোগদান করুন। হিন্দু ভয়েস, অখণ্ড ভারত, বিশ্বহিন্দু বার্তা, স্বস্তিকা, পাঞ্চজন্য, অরগানাইজার ইত্যাদি পত্রিকাগুলির গ্রাহক হন। আলোচনা করুন, লিখুন, পড়ুন ও অন্যকে পড়ান।

৩. ভোটার কার্ডের জন্য সচেষ্ট হন এবং বাড়ির প্রত্যেককে, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে ভোটার লিস্টে নাম তোলান এবং উৎসাহ দিন। সাহস করে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ভোট দিতে যান।

৪. পাড়ায় যত হিন্দু আছে, সুখে দুঃখে তাদের সঙ্গে থাকুন। পরস্পরকে সাহায্য করতে শিখুন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করুন, কীভাবে হিন্দুদের এবং দেশের ভালো হয়।

৫. জিহাদি ও পাকিস্তানপন্থী মুসলমানদের এড়িয়ে যান। তাদের দোকান, রিক্সা ও বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকুন।

৬. ছেলে-মেয়েদের হিন্দু দেবদেবী, পূজা-অর্চনা, ভাষা, পোশাকের মধ্যেও হিন্দুত্ববোধ আনুন। আরসলান, হাজি আর হাবিবের দোকান ছাড়া কি আর কোনও দোকান নেই? আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যময় সভ্যতা আর গৌরবময় সংস্কৃতির জন্য গর্ববোধ করুন। বয়স্ক মা-বাবার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা জানান। হারিয়ে যাওয়া বাঙ্গালিয়ানাকে, মূল্যবোধকে ও নৈতিকতাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনুন। স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গালিদের আত্মত্যাগ ও বলিদানের ইতিহাস ছেলে-মেয়েদের জানান।

মনে রাখবেন, বহু অত্যাচারিত ইহুদিরা দু' হাজার বছর পর ইজরায়েলকে আবার ফিরে পেয়েছে শুধুমাত্র তাদের দেশভক্তি আর দুর্জয় সাহসের বলে। সুতরাং হতাশ হবার কিছুই নেই। মাত্র ৪ বছরে মোদী যদি এই তথাকথিত এত বিরোধিতার বেড়ি পায়ে লাগিয়েও খণ্ডিত আর রক্তাক্ত ভারতকে তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম আর নিরন্তর পরিশ্রমে বিশ্বের চতুর্থ মহাশক্তিধর দেশে পরিণত করতে পারেন, তবে আমরাও কেন তাঁর সঙ্গে যোগদান করবো না আমাদের দেশকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে? এর জন্যই আমাদেরও এগিয়ে আসা উচিত নিজের কল্যাণে এবং সামগ্রিক ভাবে দেশের কল্যাণের জন্য। ■

চিঠিপত্র

ব্যধিকে না সারিয়ে আইনকে গুরুত্ব কেন?

আমরা দেখেছি, কোর্টের রায় বদলায়, বিশেষজ্ঞদের মতামত বদলায়। সুতরাং আজ যে আইন তৈরি হবে কাল তা বদলাবে না, তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু প্রকৃতির আইন কখনও বদলায় না। অর্থাৎ সত্য কখনও বদলায় না। সুতরাং প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে আজ হোক আর কাল হোক মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত্য করতেই হবে।

আমরা জানি, পুরুষে পুরুষে মিত্রতা এবং নারীতে নারীতে সখিত্ব একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে। এই মিত্রতার গণ্ডি খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পুরুষ আর নারীর, নারীর আর পুরুষের মিত্রতা এই গণ্ডির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যায় প্রাকৃতিক নিয়মেই। উভয়ের যৌনমিলনে যার সমাপ্তি ঘটে। যেহেতু নারী ও পুরুষের যৌনমিলনের ফলেই দেহের উৎপত্তি, সেহেতু দেহধারী মাত্রেরই বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে প্রেম বা যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক এবং এটাই যৌনসুখ লাভেরও একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। কিন্তু নারীতে নারীতে বা পুরুষে পুরুষে মিলনের ফলে যেহেতু দেহের উৎপত্তি হয় না, তাই নারীতে নারীতে বা পুরুষে পুরুষে যৌনাসক্তি বা প্রেম একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। যা প্রাকৃতিক নিয়মের ঘোরতর এক ব্যতিক্রম। আর যা অস্বাভাবিক, যা প্রকৃতি বিরুদ্ধ তা রোগ নামেই অভিহিত।

সুতরাং পুরুষ ও নারীর যৌন আসক্তি বা মিলনই যেখানে একমাত্র স্বাভাবিক ব্যাপার, সেখানে পুরুষে-পুরুষে বা নারীতে নারীতে যৌন আসক্তি বা মিলন কীভাবে স্বাভাবিক জীবনের ধারা হতে পারে? তাহলে তো রোগ বলেও আর কিছুই থাকবে না। কারণ, রোগও মানুষের দেহ ও মনের স্বাভাবিক ব্যাপার। রোগ যেহেতু স্বাভাবিক ব্যাপার, অতএব তা রোগ নয়—- একথা আমরা বলি কি? সুতরাং পুরুষের পক্ষে নারীতে যৌন আসক্তি যেমন স্বাভাবিক, নারীর পক্ষে পুরুষে যৌন আসক্তিও তেমনই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে তা একপ্রকার দেহবিকার, ইন্দ্রিয়বিকার, রুচিবিকার, মনোবিকার বা ব্যাধি হিসেবেই গণ্য হবে। বলাবাহুল্য, রোগ কখনও অপরাধ নয়। কিন্তু যারা মনে করে বিকৃত যৌনবোধই মানুষের মনুষ্যত্ব, অসার এই সংসারে যৌন লালসাই একমাত্র সার, অনিত্য এই জগতে যৌনতৃপ্তিই একমাত্র নিত্য বস্তু— তারাই নানাপ্রকার যৌন কদাচারকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে প্রচার করে। সেই সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও কদাচারের আমদানিকে সৃষ্টিশীলতা আখ্যা দিয়ে তাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা হিসেবে প্রমাণ করার জন্য নানাপ্রকার কু-যুক্তির আশ্রয় নেয়।

সম্প্রতি সমকামিতার পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে ধর্মবিরোধী ব্যভিচারপন্থী নাস্তিকরা স্বাগত জানিয়ে ধন্য হয়েছে। এই সব শিশ্নোদর পরায়ণ ব্যভিচারপন্থীদের বক্তব্য, অনেক বিখ্যাত প্রতিভাশালী ব্যক্তি সমকামী ছিলেন, তাই সমকামীদের অধিকার দেওয়াই উচিত। প্রশ্ন হলো, বিখ্যাত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের রোগ বা কুপ্রবৃত্তিকেও কি সমর্থন করতে হবে? উল্লেখ্য, কোনও রোগেরই প্রকৃত কারণ এখনও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি। কোনও রোগকেও এখনও পর্যন্ত নির্মূল করাও সম্ভব হয়নি। সুতরাং সমকামিতা কোনও রোগ নয়, একথা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও বলতে পারে না।

—**নরেন্দ্রনাথ মাহাতো,**
মেদিনীপুর।

চীনের 'ডিটেনশন ক্যাম্প'

খবরে প্রকাশ, কমিউনিস্ট লাল চীনে সেদেশের 'উইঘুর' মুসলমানরা এখন 'ডিটেনশন ক্যাম্পে'। এরা মূলত চীনের ঝিনঝিয়াং প্রদেশের অধিবাসী। সংখ্যালঘু এই উইঘুর মুসলমানদের মধ্যে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে আছে ঘাঁটি গেড়ে। তাছাড়া উইঘুররা কোনওদিনই চীনের অধীনতাকে মেনে নেয়নি। তারা চীনের কমিউনিস্ট শাসন থেকে মুক্তি পেতে বহুবার করেছে বিদ্রোহ। গঠন করেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন। অনেক যুবক জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিতে দেশ ছেড়েছে। চীনা প্রশাসন এ ব্যাপারে অবহিত। তাই চীনের সশস্ত্র বাহিনীও চালিয়ে যাচ্ছে এদের বিরুদ্ধে ধরপাকড়। দমনপীড়ন। কিন্তু তাতেও দমন করা যায়নি বিদ্রোহ। অগত্যা প্রশাসন দশ লক্ষাধিক উইঘুর মুসলমানকে পাঠিয়েছে ওই ক্যাম্পে। সেখানে তাদের চলছে মগজ ধোলাই, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। আর এ সম্পর্কিত খবর প্রকাশ হয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। রাষ্ট্রসঙ্ঘও প্রকাশ করেছে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলমানদের উপরে চীনা প্রশাসনের বর্বরোচিত আগ্রাসনের নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছে। চীন অবশ্য ওই মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে 'উপযুক্ত শিক্ষা' দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে দাবি করেছে।

আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে জেনেছি যে চীনা প্রশাসন সেদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-আচরণের উপর অনেক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যেমন— মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তা, মাঠ, ময়দানে ঈদের নামাজ পড়া, ইসলামিক জলসা বা ধর্মসভা করা, ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা শিক্ষা, ইসলামিক রীতি-নীতি পালন ইত্যাদি। এছাড়া প্রশাসন এমনও নির্দেশিকা জারি করেছে যে উইঘুর সম্প্রদায়-সহ সব মুসলমানদের আরবীয় নামের পরিবর্তে চীনা নাম রাখতে হবে। শুধু মসজিদেই নয়, বাড়িতেও নামাজ পড়তে পারবে না। আজান দিতে পারবে না। আবার এমনও শোনা গিয়েছে, প্রশাসন অসংখ্য মসজিদ ও মাদ্রাসা ধ্বংস করেছে, নগণ্য সংখ্যক মুসলমানকে হজে পাঠাচ্ছে। এমনকী, মুসলমানদের খাদ্য

গ্রহণে 'হারাম' ও 'হালাল' ভেদাভেদও ভুলে যেতে বলেছে। তাদের 'উন্মাদ' আখ্যা দিয়ে 'ডিটেনশন ক্যাম্পে' ঢুকিয়ে দিচ্ছে। একেই বলে, 'ঠেলার নাম বাবাজি'।

কিন্তু আশ্চর্যজনক ঘটনা হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে এসব প্রচার হলেও এব্যাপারে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি মুখে কুলুপ এঁটেছে। মুখ খুলছে না আন্তর্জাতিক ইসলামিক সংস্থাগুলি। চুপ মেরেছে এদেশেরও ইসলামের ধ্বজাধারী কমিউনিস্ট, সেকুলারিস্ট, মানবাধিকারবাদী দল ও সংগঠন। যারা আকলাক হত্যা বা গোপাচারকারীদের পিটিয়ে মারার ঘটনার কষ্টে বনধ্ ডাকে, কালো ব্যাজ পরে ধিক্কার মিছিল করে, মোদী সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধ করে, মোমবাতির মিছিলে বুক চাপড়ায়, তারাও চুপ। তাছাড়া বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পর যারা শোকে-দুঃখে 'চোখের পানি' ফেলেছে তাদেরও 'স্পিক্‌টি নট্'। কেন? কারণ দেশটি যে চীন। এমনিতেই এদেশের কমিউনিস্টদের টিকি বাঁধা পড়ে আছে চীনের সঙ্গে। তাই তাঁরা চীনের কোনও দোষ দেখতে পান না বা ভারতের বিরুদ্ধে চীনের আগ্রাসন মানেন না। ভারত বিরোধী ও চিরশত্রু পাকিস্তান তো চীনের বশংবদে পরিণত হয়েছে। ভারতকে শায়েস্তা করতে ভারতবিরোধী চীনের কাছে সে নিজের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে। তাই ভারতের বিরুদ্ধে সে যতই যুদ্ধ করুক বা ছায়াযুদ্ধ চালাক ইসলামিক জঙ্গিদের লেলিয়ে দিয়ে, চীনের বিরুদ্ধে সে নীরবদর্শক। আর অন্যান্য হীনবল মুসলমান রাষ্ট্র, যারা চীনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, তারাও চীনে মুসলমান নির্যাতনের খবর শুনেও নির্বাক। পাছে মুখ খুললে চীন রুষ্ট হয়। একেই বলে— 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম।' ভারতে মুসলমানদের গায়ে টোকা পড়লে যেখানে দেশ-বিদেশে ওঠে চিল চিৎকার, গেল গেল রব, সেখানে চীনা প্রশাসন মুসলমানদের নাম ভুলিয়ে দিলেও বিশ্ব মুসলমান সমাজে প্রতিবাদ ওঠে না। 'ভাবের ঘরে চুরি' আর কাকে বলে?'

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

হাতে হাতে তুলে দিতে হবে বই

'বই থেকে ক্রমেই আগ্রহ হারাচ্ছে নতুন প্রজন্ম' শীর্ষক খবরে জানা গেল, ইন্টারনেটে এখন সবকিছুই জানতে পারা যায়। তাই নতুন প্রজন্ম এখন আর কেউ বইমেলামুখী হতে চায় না বা বই কিনতে চায় না। তবুও প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের ছোটো-বড়ো বিভিন্ন শহরে বই মেলার আয়োজন করা হয়। এবং বই বিক্রেতারা আশায় থাকেন, তাঁরা বইমেলাতে ভালো মুনাফা করতে পারবেন বই বিক্রি করে। বই আমরা কেন কিনব এবং নতুন প্রজন্মের হাতে কেন বই তুলে দেওয়া উচিত ও কেন সকলের বই পনা উচিত সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

শিশুকে সুস্থ শরীরে মনে পেতে হলে টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোনের পাশাপাশি ওদের হাতে তুলে দেওয়া চাই বই। ফিরিয়ে আনা চাই বাঙ্গালির বই পড়ার অভ্যাস। নিভৃতে, অবসরে, বিনোদনে, ছুটিতে, যাত্রাকালে, দূরযাত্রায় পড়তে হবে, হবে পড়াতেও। পৃথিবী থেকে ক্রমাগত হারাতে থাকা মানবতা ফিরিয়ে আনতে। নিজের উৎসে ফিরতে, বাঙ্গালি মনীষার উত্তরাধিকারের ঐশ্বর্য জেনে বুঝে নিতে পড়তেই হবে বই। ধ্বংসের মুখোমুখি বইয়ের চাইতে রুখে দাঁড়ানোর মহার্ঘ অস্ত্র আর একটাও নেই। হাতে তুলে নিতে হবে যথার্থ গ্রন্থ নিঃসঙ্গতা কাটাতে, বিষাদের বুকে আনন্দধারা জাগিয়ে তুলতে। মগজের নেটওয়ার্ক বাড়াতে। বই পড়লে স্মৃতিশক্তির ধার যে বাড়ে এ নিয়ে সংশয় নেই এতটুকুও। ইতালিতে চালানো এক বড়ো মাপের সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, নিয়মিত বই পড়া মানুষ বেশি বয়সে স্মৃতি লোপের সমস্যায় ভোগেন অনেক কম। বেশি বয়সে ভুলে যাওয়া রোগ অ্যালঝাইমারের যুৎসই কোনও ওষুধ আজও নেই। বার্ধক্যে জরদ্গব বনে যাওয়া আটকাতে পারে শুধু বই পড়া। নানা ধরনের বইতে সুযোগ পেলেই ডুবে যাওয়া।

এই তো সাম্প্রতিক অতীতে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব নেভাড়ার গবেষকরা একটি সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, বাড়িতে যদি বেশি বই থাকে, তাহলে বাচ্চারা হয়তো সেগুলোর সব পড়ে না, কিন্তু যে কটা পড়ে কিংবা পাতা ওলটায়, এর মাধ্যমে তারা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি করে, আই কিউ লেভেলটাও সমবয়সিদের তুলনায় বেশি থাকে। মোটের উপর তারা বেশি বুদ্ধিমান হয়। কয়েকদিন আগে সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ এই বিষয়ে একটি গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকরা এ বিষয়ে প্রায় ১০০ শতাংশ একমত, যে বেশি বেশি বইয়ের মধ্যে যেসব বাচ্চারা বড়ো হয়, তাদের উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

—**মণীন্দ্রনাথ সাহা,**
গাজোল, মালদহ।

বিজেপি হটানো দল

আজকাল খবরের কাগজ ফেসবুক, টিভি রেডিও খুললে দেখা এবং শোনা যাচ্ছে বেশির ভাগ দল একজোট হচ্ছে শুধু বিজেপিকে হটানোর জন্য। বিজেপিকে হটানোই যদি দলের উদ্দেশ্য হয় তাহলে আর দলের আদর্শ থাকল কোথায়। প্রতিটা দলই একটা একটা আদর্শ নিয়ে ছোটে সেটা সবই জনস্বার্থে। কিন্তু যে ভাবে বেশীর ভাগ দলের চাকা এক যোগে রমরমিয়ে ছুটছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এদের উদ্দেশ্যই গেরুয়া শিবিরকে ফাঁদে ফেলা। এদের ভাব ভঙ্গিতে বোঝা যায় বিজেপি যেন জনগণের কোনও উপাকারেই লাগেনি। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যারা যারা বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হচ্ছে তাতে তাদের নিজের দলের নাম পালটে তাদের দলের নাম রাখা উচিত বিজেপি হটানো দল।

—**স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

‘মি-টু’ : গরিব মহিলাদের নির্যাতিনের কথা কেউ বলছেন না

সুতপা বসাক ভড়

‘মি টু’ অর্থাৎ ‘আমিও’ শব্দ দুটি সংবাদমাধ্যমের দ্বারা আমাদের কাছে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। মহিলাদের আত্মরক্ষা এবং আত্মমর্যাদা রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এই ছোট্ট শব্দ দুটি। ‘মি টু’ মহিলাদের সুরক্ষা ও সম্মানের বিরুদ্ধে পুরুষদের অন্যায় প্রবৃত্তিগুলিকে কেবলমাত্র সামাজিক অন্যায়রূপে চিহ্নিত করেনি বরং সামাজিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এমনকী বিভিন্ন নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের শুচিতা রক্ষায় পরিবর্তিত মনোবিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। বর্তমান নারী, পুরুষের যৌন দুরাচার নিয়ে অপরাধবোধে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত না হয়ে উচ্ছৃঙ্খল পুরুষদের সমাজের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করাবার মতো সাহস দেখাতে শুরু করেছে। সুতরাং, নারীর এই প্রবৃত্তিকে সামান্য ঘটনা বলে উপেক্ষা করার কোনও উপায় নেই। আমাদের দেশে ‘লজ্জাই নারীর ভূষণ’— এই লোকাচারটি নানারূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এই লজ্জার আবরণকে অতিক্রম করে সত্যকে সমাজের সামনে নিয়ে আসার মতো সাহস একটি কঠিন এবং অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। কারণ লোকাচার যখন বৃহদাকার হয়ে ধর্মাচারের বিরুদ্ধাচারণ করে, তখন সেই সমাজের অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী হতে বাধ্য। সেজন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বর্তমান নারী তুচ্ছ লোকাচারকে উপেক্ষা করে সত্যের পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে।

লজ্জার আবরণ ভেদ করে যৌন শোষণের বিরুদ্ধাচারণ করা— ভারতীয় নারীর আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তির পরিচয়। ‘মি টু’ আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে মহিলা-পুরুষ দু’ পক্ষকেই

অঙ্গনা

যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। এই আন্দোলনের সম্ভাব্য শিকার হতে চলেছে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কার্যরত উচ্চ পদাসীন পুরুষেরা। এদের মধ্যে অন্যায়কারী পুরুষেরা চেষ্টা করবে এই আন্দোলনকে নারী বনাম পুরুষের লড়াইরূপে প্রতিপন্ন করতে, যাতে আন্দোলনটি দুর্বল হয়ে পড়ে। সেজন্য, এক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই সতর্ক থাকতে হবে। বস্তুত, এই আন্দোলন ‘যৌন শোষণের’ মতো সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে কার্যরত। এক্ষেত্রে মহিলাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য তারা অন্যায়ভাবে পুরুষদের লাঞ্ছিত না করে। অপরদিকে, পুরুষদেরও সচেতন হতে হবে, যাতে কিছু স্বার্থান্বেষী মহিলা তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করতে না পারে। বস্তুত, এই আন্দোলন যৌন শোষণের বিরুদ্ধে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, যৌন শোষণের শিকার কেবলমাত্র নারী নয়, অনেকক্ষেত্রে পুরুষেরাও। অনেক বাচ্চা (ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে) ছোটো বেলায় যৌন শোষণের শিকার হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই এ ব্যাপারে কাউকে বলতে পারে না— কেউ কেউ অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায় বা অপরাধের দুনিয়াতে পৌঁছে যায় কিংবা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সেজন্য পুরুষদেরও উচিত এই আন্দোলনে মহিলাদের পাশে থাকা এবং আন্দোলন যাতে আরও ব্যাপকহারে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে যায়, সেজন্য চেষ্টা করা।

‘মি টু’ এখনও পর্যন্ত উচ্চবর্গীয় এবং কর্মরতা মহিলাদের মধ্যেই সীমিত আছে। ওইসব সাহসী মহিলারা লোকলজ্জা ছেড়ে দেরিতে হলেও সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। কিন্তু উচ্চ, মধ্যম, নিম্ন বর্গীয় অনেক মহিলারাই তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কথা সবার সামনে আনতে পারছেন না। এর কারণ মূলত আর্থিক আত্মনির্ভরশীলতা না থাকা। সাধারণত স্বনির্ভর মহিলারা যেভাবে সমাজে তাঁদের বক্তব্য রাখেন, বাকিরা তা পারেন না, কারণ বাস্তবে ওই কঠিন অসত্যের আবরণ ভেঙে সত্যকে উদঘাটন করার জন্য আর্থিক স্বনির্ভরতা নিতান্তই আবশ্যক। একদিকে মহিলারা ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন ধরনের কাজে সক্রিয় যোগদান করছেন, অপরদিকে এই সমস্যা আরও বিশাল রূপ ধারণ করে চলেছে। তবে হ্যাঁ, এমন কিছু নগণ্য মহিলা আছে, যারা যৌনতাকে হাতিয়ার বানিয়ে কর্মক্ষেত্রে সফল হবার চেষ্টা করে। এইসব ক্ষেত্রে পুরুষসমাজকে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে।

‘মি টু’-র পরিধিতে কর্মক্ষেত্রে ছাড়াও বাড়ি, পাড়া, বিদ্যালয়, ক্লাব ইত্যাদি সবকিছুই আনা প্রয়োজন। কারণ, একটি মেয়ে অনেক সময় ছোটো বয়স থেকেই এইসব জায়গায় অশ্লীলতার শিকার হয়ে পড়ে। সংগঠিত এবং অসংগঠিত ভাবে নানা প্রকারে মহিলাদের সঙ্গে যৌন উৎপীড়ন করা হয়ে থাকে। এই ধরনের ঘটনাগুলিকেও কী ‘মি টু’-র পরিধিভুক্ত করে অন্যায়কারীদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা যায় না? ■

শীতকালে সাবধানে থাকুন হতে পারে নিউমোনিয়া

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

শীতকাল পড়লেই বিশেষত অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত যাঁদের ঠাণ্ডা লাগার ধাত রয়েছে, তাঁদের একটু সাবধানে থাকতে হবে। এসময় ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ, অ্যাজমা, নিউমোনিয়া এসবের সমস্যা বাড়ে। এসময় বাতাসে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির প্রকোপ বাড়ে, এর ফলে ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি কাশি,শ্বাসনালীতে প্রদাহ ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর থেকেই হয় নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়ার লক্ষণ হলো জ্বর, সর্দি, কাশি, প্রবল শ্বাসকষ্ট, বুকে সর্দি বসে যাওয়া, আর এগুলো হওয়া মানেই শ্বাসনালীতে ও সংক্রমণ হয়ে প্রদাহ হওয়া।

কাদের হয় :

শীতকালে ছোটোদের এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের, যাঁরা অতিরিক্ত ধূমপান করেন, ফুসফুসে আগেই কোনও সংক্রমণ হয়েছে, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কম, অল্পেতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়, ক্যান্সার জাতীয় রোগে শরীরে ইমিউনিটি ক্ষমতা কমে গেছে, দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড ওষুধ নিচ্ছেন, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগীদের নিউমোনিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে দেখতে হবে তাদের শাসকষ্ট রয়েছে কিনা। এ বিষয়ে চিকিৎসকরা বলেন, দুই মাস বয়সের শিশুর মিনিটে ৬০ বার, এক বছরের শিশুর মিনিটে ৪০ বার বুক ধড়ফড় করে প্রবল কষ্টে শ্বাস নিলে তাকে বলে শ্বাসকষ্ট। সঙ্গে যদি মারাত্মক ঠাণ্ডা লাগা এবং জ্বর থাকে, তাহলে অভিভাবককে দ্রুত সতর্ক হয়ে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। নিউমোনিয়া ধরা না পড়লে বা সঠিক চিকিৎসা না করিয়ে বাড়িতে রেখে দিলে এর থেকে শিশুমৃত্যু ঘটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

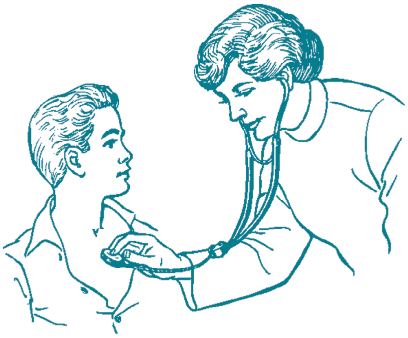

কীভাবে আটকানো সম্ভব :

ধূমপান বন্ধ করতে হবে। কেননা ধূমপান থেকে যে ফুসফুসের ক্ষতি হয় তা আগেই বলেছি। যাঁরা অতিরিক্ত ধূমপান করেন, তাঁদের নিউমোনিয়া হলে ভয়ঙ্কর জটিল আকার ধারণ করে। ধোঁয়া, ধুলো, বালি অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকুন। শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে রাস্তায় বেরোনোর সময় দূষণের হাত থেকে বাঁচতে ব্যবহার করুন মাস্ক।

যখন শীত পড়বে আর চলে যাবে, সেই সময়টায় একটু সাবধানে থাকুন, গরম জামাকাপড় পরা গরম জলে স্নান, ঠাণ্ডা না খাওয়া— এগুলো মেনে চলুন। মোটের উপর এমন ভাবে চলুন যাতে ঠাণ্ডা না লাগে।

শিশুদের বেশিক্ষণ বাইরে ধুলোবালির মধ্যে খেলতে দেবেন না।

বাইরে থেকে ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার অভ্যেস গড়ে তুলুন। এতে রোগজীবাণু চলে যাবে।

মরশুমি ফল যেমন বেদানা, কমলালেবু, আঙুর কিংবা সবুজ শাকসবজি খাবারে বেশি করে রাখুন। এতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ছোটোদের মশার ধূপ, রান্নার গ্যাস, ধোঁয়ার কাছাকাছি আসতে দেবেন না।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা :

নিউমোনিয়া সম্পূর্ণ সারতে দুই থেকে তিন সপ্তাহ মতো সময় লাগে। তবে বিশেষ ভাবে বলব নিউমোনিয়া ফুসফুসের একটি জটিল অসুখ। তাই উপসর্গ দেখে এই অসুখে নিজের মতো ডাক্তারি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। নাহলে রক্তে জীবাণুর সংক্রমণ বা ফুসফুসে জল জমে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কারণ ও লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নির্বাচন এবং প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী টিউবারকুলিনাম, অ্যান্টম ট্র্যাট, অ্যান্টিম আর্স, সেনেগা, জাস্টিসিয়া, হিপার সালফার, ফাইটোলাক্কা, স্পঞ্জিয়া প্রভৃতি ওষুধের ব্যবহার করা যায়। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(ফোন নং : ৯৮৩০০২৩৪৮৭/ ৯৮৩০৫০২৫৪৩)

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন নাগরিকত্ব আইন সংশোধন ও জাতীয় নাগরিকত্ব চালু করা

মোহিত রায়

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব কি বিপন্ন? এই প্রশ্নটা বেশিরভাগ পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে হয়তো অদ্ভুত মনে হবে। বলবেন কেন আমরা তো বেঁচেবর্তে আছি। সব রাজ্যের বিভিন্ন আর্থিক সমস্যা থাকে, পশ্চিমবঙ্গেরও আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই থাকবে কিনা এমন আজব কথা তো শুনিনি। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষা করা মানেই বা কি? পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটা কি আর থাকবে না? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের বাইরে চলে যাবে? এসব যদি না হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষা করার আলাদা করে কী দরকার আছে? তাহলে পশ্চিমবঙ্গ তো আছেই।

পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে বেশিরভাগ মানুষের এই ভাবনার কারণ এই যে, প্রশ্নটা আমরা এখনো কোথাও তুলেই ধরিনা। শিক্ষিত বাঙালি মহলের আলোচনায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কে, দৈনিক সংবাদপত্রে, টেলিভিশনের চ্যানেলে--- কোথাও এ নিয়ে আলোচনা হয়নি। সুতরাং বেশিরভাগ মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের সমস্যা বলে কিছু নেই। অসুস্থ মানুষ অনেক সময় নিজেই জানে না যে সে অসুস্থ। সে বলে আমি তো বেশ ভালোই আছি। প্রশ্ন করলে জানা যাবে যে তিনি তার শারীরিক বিভিন্ন বিষয়ের যেমন রক্তচাপ, শর্করা ইত্যাদির পরিমাপ এখনো করাননি। একটু বেশি প্রশ্ন করলে জানা যাবে যে তার কিছু কিছু উপসর্গ আছে কিন্তু সেসবের তোয়াক্কা তিনি করেন না। তিনি তো মনে করেন বেশ ভালোই আছেন। যেমন এখনো পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশ মনে করে তারা ভালোই আছেন।

পশ্চিমবঙ্গ কেন ও কীভাবে তৈরি হয়েছিল এই বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের স্কুল কলেজে ঠিকমতন জানানো হয় না। নতুন প্রজন্মের মানুষেরা জানেন যে স্বাধীনতার সময় ইংরেজরা চক্রান্ত করে ভারতবর্ষকে ধর্মের নামে ভাগ করে দিয়ে যায়। এভাবেই বাংলা ভাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়। ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যুক্ত বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) মুসলমানরা ছিল ৫৬ শতাংশ আর হিন্দুরা ৪৪ শতাংশ। দুটি পক্ষের মধ্যে জনসংখ্যায় ফারাক খুব বেশি ছিল না, কিন্তু মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল পুরো বাংলাই যাক পাকিস্তানে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান শাসিত কোনও স্থানে তাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ফলে বাংলা ভাগ হবে কিনা, না কোনও দেশে যুক্ত হবে তা নিয়ে ১৯৪৭ সালের ২০

জুন বঙ্গীয় আইনসভায় ভোটাভুটি হয়। সেদিন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরি হলো পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। বাংলার হিন্দুপ্রধান অংশগুলির প্রতিনিধি নিয়ে তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। এই ভোটে তফসিলি প্রতিনিধিরা-সহ সব হিন্দু প্রতিনিধিই বাংলা ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে ভোট দেন। পশ্চিমবঙ্গ সেদিনই তৈরি হয়ে গেল। অর্থাৎ এককথায় পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের দুটি ভিত্তি

(১) যথেষ্ট সংখ্যায় হিন্দুদের সংখ্যাগুরুত্ব (কেবল ৫০ শতাংশ নয়), যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা চিহ্নিত হলো। এই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনসংখ্যা হলো ৮০ শতাংশ।

(২) পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতির অবাধ চর্চা, ভারতীয় ও হিন্দু বিরোধী সংস্কৃতির অবসান, হিন্দু নারীদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা ও বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক সমাজ।

এই দুটি শর্তই ভীষণভাবে লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। সেজন্যই আমরা বলছি পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন। তাহলে আমাদের মুক্তির পথ কী? প্রথমেই ভারত সরকারের জনগণনার তথ্য থেকে দেখে নেওয়া যাক মুসলমান জনসংখ্যা কতটা বেড়েছে এবং কীভাবে এই বৃদ্ধি হয়েছে। *সারণীটিতে চোখ রাখলেই তা পরিষ্কার হবে।*

লক্ষ্য করবেন যে, ১৯৫১ সালে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ১৯.৮৪ শতাংশ। ১৯৮১ সালে এটা হয়েছে ২১.৫১ শতাংশ। অর্থাৎ ত্রিশ বছরে জনসংখ্যায় অনুপাত বেড়েছে ১.৬৬ শতাংশ। অথচ এই সময়ে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বাড়বার কথাই নয়, বরং অনেকটা কমে যাবার কথা। এর কারণ এই ত্রিশ বছরে প্রায় ১ কোটি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন ফলে জনসংখ্যায় হিন্দুর অনুপাত বেড়ে যাবার কথা। কিন্তু এর উল্টোটাই হলো, কারণ প্রধানমন্ত্রী নেহরুর করা নেহরু লিয়াকত চুক্তিতে আশকারা পেয়ে, যেসব মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে এসে সম্পত্তি ফেরত পেয়ে জাঁকিয়ে বসলেন। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় এলো কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্ট পার্টি দেশভাগের সময় পুরো বাংলাকেই পাকিস্তানে দেবার পক্ষে বলেছিল। এবার ক্ষমতায় এসে তারা সেই কাজটাই শুরু করলো। তারা বাংলাদেশি মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের অবাধ অধিকার দিয়ে দিল। ফলে ১৯৮১ থেকে ২০১১ এই ত্রিশ বছরে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বাড়লো তিনগুণ একেবারে ৫.৫ শতাংশ। মনে রাখতে হবে এই সময় বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুরাও পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছেন। এই ভয়ংকর মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তিটাকেই নষ্ট করে দিল। এর ভয়াবহতা বোঝা যাবে একটি তথ্যে। ১৯৫১ সালে মালদহ জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৩৮ শতাংশ, সেটা ২০১১ সালে বেড়ে হলো ৫১ শতাংশ। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রাথমিক শর্তটি অর্থাৎ ৮০ শতাংশ হিন্দুর দেশ সেই শর্তটিই লঙ্ঘিত হলো এবং যেভাবে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটছে তাতে দু-তিন দশকের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে ইসলামি শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার জন্য অপেক্ষা করে না, ৩০ শতাংশ পেরোলেই তারা পেশি শক্তির জোরে যে কোনও দেশকে বাগে এনে ফেলে, পশ্চিমবঙ্গে এখন যা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধর্মীয় জনসংখ্যার সমস্যা না মেটানো গেলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই থাকবে না।

জাতীয় নাগরিকপঞ্জি

সম্প্রতি অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (National Register of Citizens-NRC) প্রকাশিত হয়েছে। নাগরিকপঞ্জি তৈরির উদ্দেশ্য রাজ্যে বিদেশি অবৈধ নাগরিকদের চিহ্নিত করা ও পরে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে অবৈধ বিদেশি বলতে বোঝায় বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমানদের। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ অনেক সংগ্রাম রক্তক্ষয়ের পর ১৯৮৫ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় সরকার ছাত্রদের যেসব দাবি মেনে নেয় তার একটি প্রধান দাবি ছিল অসমে বসবাসকারী বিদেশিদের চিহ্নিত করবার জন্য জাতীয় নাগরিকপঞ্জিকে নতুন করে আবার তৈরি করা। ৪৩ লক্ষের বেশি কিছু অসমবাসীকে বিদেশি হিসাবে চিহ্নিত করা গেছে, যদিও তাদের আবার আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। কোনও দেশ দখলের জন্য সৈন্যবাহিনীর থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী অস্ত্র হলো অনুপ্রবেশ। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে বর্তমান অসমে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২৪.৭ শতাংশ। তার কুড়ি বছর পর ১৯৭১ সালে সেই অনুপাত প্রায় একই থাকে, ২৪.৬ শতাংশ। ১৯৮১ সালে আন্দোলনের জন্য জনগণনা হয়নি। ১৯৯১ সালে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বেড়ে হয়ে গেল ২৮.৪ শতাংশ। অর্থাৎ আগের কুড়ি বছরে বৃদ্ধিই হয়নি অথচ ১৯৭১ সালের পর অর্থাৎ বাংলাদশ হবার পর কুড়ি বছরে বেড়ে গেল ৪ শতাংশ। ২০১১ সালে মুসলমান জনসংখ্যা হলো ৩২.২ শতাংশ অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে ১০ শতাংশ বেড়ে গেল। এর পর যে অসমের মানুষ তাদের তাদের অস্তিত্ব নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়বেন তা স্বাভাবিক।

কিছু রাজনৈতিক দল বাংলাদেশি মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের বলতে শুরু করেছে যে, হিন্দুদেরও তাড়ানো হবে। এই ভয় আরও প্রচার করছে আমাদের প্রধান সংবাদপত্রগুলি ও টিভি চ্যানেলগুলি। ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫-তে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার পাসপোর্ট আইন ও বিদেশি আইন সংশোধন করেছে। এতে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে আগত সেদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি) ভারতে থাকবার আইনি অধিকার পেল। এই আইন সংস্কারে রাষ্ট্রসংঘের উদ্বাস্তুর সংজ্ঞাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে একমাত্র অন্য দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাই উদ্বাস্তুর মর্যাদা পেতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যেও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (NRC) তৈরির দাবি উঠেছে। ১৯ জুলাই ২০১৬-তে লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধন বিল ২০১৬ পেশ হয়েছে। এতে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু বৌদ্ধ ইত্যাদিদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং অসমের বা পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ থেকে নিপীড়িত হয়ে আসা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের আতঙ্কের কিছু নেই। বাঙালি আবেগ তুলে আসলে রক্ষা করতে চাইছে বাঙালি নয়, বাংলাভাষী বিদেশিদের। উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারীদের এক করে দেখানোর চক্রান্ত আমরা চলতে দেবো না।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-২০১৬

বাংলাদেশ গঠিত হবার পর ১৯৭২ থেকে যে সব উদ্বাস্তুরা আসতে থাকলেন আগের মতো তাঁদের জন্য কোনও আইনি রক্ষা ব্যবস্থা

ছিল না। ফলে সেইসব উদ্বাস্তুরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাননি। যদিও প্রায় সবার কাছেই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড থাকলেও সেগুলি দিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণ করা যায় না। গত কয়েক দশক ধরে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলি নাগরিকত্বের দাবি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে বারবার করে এসেছেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোনও প্রধান রাজনৈতিক দল উদ্বাস্তুদের এই স্বীকৃতির জন্য কোনও প্রচেষ্টা নেয়নি। ১৯ জুলাই ২০১৬-তে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ পেশ করেন। এই সংক্ষিপ্ত বিলটিতে বলা হয়েছে যে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের যাঁদের পাসপোর্ট আইন, ১৯২০ ও বিদেশি আইন ১৯৪৬-এ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাঁদের আর অবৈধ অভিবাসী বলে গণ্য করা হবে না। সংখ্যালঘু বলতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন ও পার্শিদের উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে তাঁরা ভারতীয় নাগরিক হবার জন্য যোগ্য হলেন। কোনও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি ছাড়ার বা ভারত ছাড়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, বরং তাঁরা আগামী দিনে ভারতের নাগরিকত্বও পেয়ে যাচ্ছেন। এই আইনটি পাস হয়ে গেলে হিন্দু উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এই অধিকার পাবে না। গত ৫০ বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনও মুসলমানকে উদ্বাস্তু হতে হয়নি। কিন্তু পূর্বপাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে হিন্দু-বৌদ্ধ- খ্রিস্টান উদ্বাস্তুদের আগমন আজও বন্ধ হলো না। আশ্চর্য, বাংলাদেশে কোনও উদ্বাস্তু সমস্যা নেই অথচ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা শেষ হবার কোনও লক্ষণ নেই। এই বিলটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ধারণ করবে।

বাংলাদেশ গঠনের পর বিশেষত বামফ্রন্ট সরকার আসার পর দলে দলে বাংলাদেশি মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে থাকে। ৬ মে, ১৯৯০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভায় বলেছিলেন যে ভারতে ১ কোটি বাংলাদেশি আছে। ১১ অক্টোবর ১৯৯২-এর গণশক্তি পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু লিখলেন, ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বি এস এফ ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫২৯ জন বাংলাদেশিকে তাড়িয়ে দিয়েছে...মোবাইল টাস্ক ফোর্স ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৮৫ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এরপর ১৪ জুলাই ২০০৪ সালে কংগ্রেসের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সোয়াল লোকসভায় জানালেন যে ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বাংলাদেশি রয়েছে। অবশেষে ২০০৫-এ লোকসভাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যা ও সিপিএম তাদের দিয়ে ভোট করানোর অভিযোগ তুলে স্পিকারকে কাগজপত্র ছুঁড়ে হৈচৈ বাঁধালেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ যে ভয়ানক সমস্যা তা জ্যোতি বসু থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই জানেন। জ্যোতি বসুরা বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে মূলত ভোটের খেলা খেলছিলেন ক্ষমতায় থাকার জন্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ করবার ইসলামি পরিকল্পনায় মদত দিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনবিন্যাস ১৯৫১-২০১১							
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
হিন্দু	৭৮.৪৫	৭৮.৮০	৭৮.১১	৭৬.৯৬	৭৪.৭২	৭২.৪৭	৭৪.৫৪
মুসলমান	১৯.৮৫	২০.০০	২০.৪৬	২১.৫১	২৩.৬১	২৫.২৫	২৭

অসমে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি (শতাংশের ভিত্তিতে)						
বর্ষ	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৯১	২০০১	২০১১
মুসলমান	২৪.৬৮	২৫.৩	২৪.৫৬	২৮.৪৩	৩০.৯১	৩৪.২২
১৯৮১-তে অসমে জনগণনা হয়নি।						

পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গ যে আদর্শে গঠিত হয়েছিল তা ফিরিয়ে আনতে, সংসদে নাগরিকত্ব বিল পাশ করে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গেও নাগরিকপঞ্জি নবায়ণের (এন আর সি) কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে, তাদের বিতাড়ন করেই একমাত্র নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়া যাবে নইলে এর একমাত্র ভবিষ্যৎ পশ্চিমবাংলাদেশ হয়ে যাওয়া। এর জন্য কোনও হিন্দু খ্রিস্টান উদ্বাস্তু বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

এরপরই শুরু হলো মুসলমান তোষণবাদীদের খেলা। এই আইনটি পাস হয়ে গেলে হিন্দু উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এই অধিকার পাবে না। ফলে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়নের কোনও আইনি জটিলতা থাকবে না। ফলে বাংলাদশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের জন্য মাঠে নেমে পড়লেন 'সেকুলার' নেতারা। বিলটি লোকসভায় পেশ করা হলে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি প্রধান দল তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআইএম ও কংগ্রেস-এর বিরোধিতা করলো। এঁদের বিলের বিরোধিতার কারণ একটাই--- কেন এই বিল থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়া হলো। এঁদের সবার মূল কথা— এই বিল সংবিধান বিরোধী। এটি সংবিধানের ১৪ নং মৌলিক অধিকারকে খর্বিত করে। ধর্মের ভিত্তিতে এই বিভাজন সম্ভব নয়। এই অভিযোগগুলির জবাব— এই আইনটি করা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা অনুযায়ী যা আগেই বলা হয়েছে। সত্যিকারের উদ্বাস্তু স্বার্থে যারা আন্দোলন করেন তাদের উচিত এই তিনটি দলের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের সচেতন করা ও এদের ইসলামি তোষণবাদী রূপকে চিনিয়ে দেওয়া। যাদের অত্যাচারে উদ্বাস্তু হয়ে মানুষেরা পালিয়ে এসেছেন সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করাই এই তিনটি দলের মূল উদ্দেশ্য। এজন্যই এই বিলটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ধারণ করবে। ■

বিল পাশে প্রধান বাধা ভোটের লালসা

এই মুহূর্তে ভারতীয় রাজনীতির অলিন্দে একটি বহু চর্চিত বিষয় হলো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৬। বিলটি সংসদে পেশ হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৫ জুলাই, কিন্তু কংগ্রেস ও তৃণমূলের বিরোধিতায় রাজ্যসভায় পাশ হতে পারেনি।

দেবযানী ভট্টাচার্য

এটি হলো ১৯৫৫ সালের ভারতের আদত নাগরিকত্ব আইনের অর্থাৎ দি সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট, ১৯৫৫-র একটি প্রস্তাবিত সংশোধনী, যা ঝুলে রয়েছে। আগামী শীতকালীন অধিবেশনে এই বিল সংসদে পেশ হওয়ার কথা, কিন্তু এবারও বিরোধীদের প্রবল আপত্তিতে তা হবে না।

কী আছে ২০১৬-র এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে?

নাগরিকত্ব বিলের মূল স্পিরিট ও প্রস্তাব হলো এই যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো ইসলামিক দেশগুলিতে বসবাসকারী সেই সব দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ যদি প্রাণের দায়ে অথবা মান, সম্ভ্রম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে ভারতবর্ষে চলে আসেন, তবে ভারত সরকার তাঁদের আশ্রয় দেবে এবং তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার শর্তও কিছু শিথিল করা হবে।

শুধু আফগানিস্তান, পাকিস্তান আর বাংলাদেশেই কেন?

কারণ এই দেশ তিনটি বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও আদতে অবিভক্ত ভারতের অংশ। ফলে এইসব দেশের অধিবাসীরা আদতে ও উৎপত্তিগতভাবে ভারতেরই অধিবাসী। বর্তমানে ওই দেশগুলি ইসলামিক দেশ হওয়ায় তাদের সংখ্যাগুরু মুসলমান জনসাধারণের সুরক্ষার যথার্থ ব্যবস্থা তারা রেখেছে। এই দেশগুলির সংখ্যালঘু নাগরিকরাও যদি দেশগুলিতে সম্মানের সঙ্গে বাস করতে পারেন, তবে সেই হলো আদর্শ পরিস্থিতি। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সেই আদর্শ পরিস্থিতির মিল প্রায়শই পাওয়া যায় না। এইসব ইসলামিক দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নানাভাবে অত্যাচারিত হন বা রাষ্ট্রীয় সুযোগ- সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। ইসলামিক আইন তাঁদের উপরেও প্রযোজ্য হওয়ার কারণে তাঁদের নিজস্ব রীতি নীতি অনুযায়ী জীবনের বহু মৌলিক অধিকার প্রায়শই খর্ব হয়। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষ এইসব মানুষের প্রতি তার নৈতিক দায় অস্বীকার করতে পারে না, কারণ আদতে এঁরা ভারতেরই অধিবাসী। কেবলমাত্র দেশভাগের ফলে ইসলামিক দেশের অধিবাসী হতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে তাঁরা যদি প্রাণ বা মান বাঁচাতে ভারতে চলে আসতে চান, নিজের সংস্কৃতি রক্ষা করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান, তবে তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব ভারতবর্ষের আছে।

২০১৬-র বিলে কী কী সংশোধনী আনা হয়েছে?

দি সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট, ১৯৫৫-এ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, ২০১৬-র বিলে সেই সংজ্ঞা থেকে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ৩১.১২.২০১৪-র আগে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন্য, পার্সি এবং খ্রিস্টানদের বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ঢুকতে বা থাকতে গেলে কাদের পাসপোর্ট লাগবে তা নির্ধারিত হয় পাসপোর্ট অ্যাক্ট ১৯৫০ অনুযায়ী। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে এই আইনের একটি সংশোধন হয়েছে যার বলে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-র আগে যদি কোনও হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি বা খ্রিস্টান ভারতে এসে থাকেন, তবে তাদের ভারতে থাকার পাসপোর্ট লাগবে না।

ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬-এর অধীনে ফরেনার্স অর্ডার ১৯৪৮ অনুসারে কোনও বিদেশি ব্যক্তি বৈধ পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে ঢুকলে বা পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে থাকলে, তাকে আইনের হেফাজতে নিয়ে আটকে রাখা যায়। এই আইনেরও সংশোধন হয়েছে ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে। সংশোধনী অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্ব, ২০১৪-র আগে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা কোনও ব্যক্তি

যদি হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি বা খ্রিস্টান হন, তবে পাসপোর্ট না থাকার কারণে ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬-এর আওতায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। এবং তাঁরা বস্তুত শরণার্থী হিসেবে ভারতবর্ষে থাকতে পারবেন।

বৈধ পাসপোর্ট ছাড়া কোনও বিদেশি নাগরিক যদি ভারতে আসেন বা অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত সময় ভারতবর্ষে বাস করেন, তবে দি সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট, ১৯৫৫ অনুযায়ী তাঁকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু নাগরিকত্ব বিল ২০১৬-র একটি অন্যতম প্রস্তাবিত সংশোধন হলো, সংশোধিত পাসপোর্ট অ্যাক্ট, ১৯২০ এবং ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৪৬-এর অধীনে ফরেনার্স অর্ডার, ১৯৪৮-এর সংশোধন অনুযায়ী যাঁদেরকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের আর অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে গণ্য করা যাবে না।

অর্থাৎ নাগরিকত্ব বিল, ২০১৬ পাশ হলে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪-র আগে আফগানিস্তান বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে ভারতে থাকতে আসা কোনও ব্যক্তি যদি হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি বা খ্রিস্টান হন, তবে তাঁকে আর অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে না।

তাছাড়াও সাধারণ ভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে গেলে যত বছর ভারতে থাকতে হয়, এই বিলে সেই সময়সীমাও এই মানুষদেরকে জন্য শিথিল করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও মানুষ যেমন হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টানরা ভারতে একটানা ছ'বছর থাকলেই নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা হয় ন্যূনতম ১১ বছর।

এই বিলটি বিরোধীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কেন?

অনুপ্রবেশের সমস্যা ভারতবর্ষের অন্যতম সমস্যা। বিশেষ করে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনবরত এদেশে ঢুকে পড়ছে অবৈধ বাংলাদেশিরা। এরা ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে লোভনীয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এরা ভোটে জেতার অন্যতম চাবিকাঠি। তাই অনুপ্রবেশকারী আর শরণার্থীর শ্রেণীবিভাগ খুব স্পষ্টত হোক— এটা ওঁরা চাইছেন না। তাতে ভোট-ব্যবসার পথ বন্ধ হবে।

দেশভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতেই। তখন যাঁরা নিজেদের অংশ বুঝে নিয়ে সেই অংশে নিজেদের ইসলামিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, তাঁদের যে আবার এদেশের মাটিতে ভাগ বসানোর ন্যায়সঙ্গত অধিকার নেই, এই সত্যকে স্বীকার করার সৎসাহস ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেই।

তাছাড়া অনুপ্রবেশকারী আর শরণার্থীর শ্রেণীবিভাগ খুব স্পষ্টত করা হবে, এই ছিল ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি। তিনি যাতে এই বিষয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারেন, তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন বিরোধীরা।

তাছাড়া ধর্মের ভিত্তিতে কিছু মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ারও বিরোধিতা করেছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য হলো আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টানদের নাগরিকত্বের জন্য বিবেচনা করা হয়, তবে সেসব দেশের মুসলমানদেরই বা নয় কেন?

কিন্তু দেশভাগের অপ্রীতিকর সত্যকে স্মরণ করলে আমাদের সকলেরই মনে পড়বে যে দেশভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতেই। এবং তখন যাঁরা তাঁদের নিজেদের অংশ বুঝে নিয়ে সেই অংশে নিজেদের ইসলামিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, তাঁদের যে আবার গোপনে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এদেশের মাটিতে ভাগ বসানোর ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত অধিকার নেই, সেই কঠোর ও তিক্ত সত্যকে স্বীকার করার সৎসাহস ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেই। তাই আপাতত নাগরিকত্ব বিল ঝুলে থাকল ততদিন, যতদিন পর্যন্ত না সর্বসম্মতিক্রমে এই বিল পাশ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ▌

অতীত ভুলে আত্মহননে মত্ত হিন্দু বাঙ্গালি

আবীর গাঙ্গুলী

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী এক নয়। ইউনাইটেড নেশানস হাইকমিশন ফর রিফিউজি-র সিদ্ধান্ত বলছে যে, ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা রাজনৈতিক কারণে যদি কেউ অন্য দেশে আশ্রয় নেয় এবং প্রাণভয়ে আর সে দেশে ফিরে যেতে না চায় তাহলে তাকে শরণার্থী বলা হবে। পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশে গত ১৯৪৬ সাল থেকে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি সংখ্যালঘুরা ভারতে বা যেসব দেশে আশ্রয় নিয়েছে তারা শরণার্থী হিসাবে গণ্য হবে। অপর দিকে যেসব বাংলাদেশি মুসলমান সন্ত্রাস বা নাশকতার উদ্দেশ্য নিয়ে বা অর্থনৈতিক কারণে ভারতবর্ষে এসেছে তারা সবাই কিন্তু অনুপ্রবেশকারী, কারণ তারা শরণার্থী বা উদ্বাস্তু নয়।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতনের ইতিহাস :

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি জেলায় মুসলমান মৌলবাদীরা পরিকল্পিত ভাবে লুঠ হত্যা আর গণধর্ষণ চালায় এবং ফলশ্রুতিতে প্রায় ৫ হাজার হিন্দুকে প্রাণ হারাতে হয়। শত শত হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। হাজার হাজার হিন্দুকে জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। বাকি হিন্দুদের থেকে জিজিয়া কর নেওয়া হয়। ৫০/৬০ হাজার হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন, যারা পরবর্তীকালে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন।

১৯৫০ সালে যখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্গত সেই সময় ঢাকাতে শুরু হলো ভয়ানক দাঙ্গা। একদিনে হত্যা করা হলো ৬০০ থেকে ৭০০ হিন্দুকে। হিন্দুর রক্তে লাল হয়ে গেল ঢাকেশ্বরী মায়ের সাধের ঢাকা। অবশেষে প্রায় ৬০/৭০ হাজার হিন্দু ভারতে চলে আসতে বাধ্য হলেন। তাঁরা হলেন উদ্বাস্তু বা শরণার্থী। এরপর বরিশাল জেলাতে শুরু হলো হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন। শুধুমাত্র বরিশালেই সাত থেকে আট হাজার হিন্দু হত্যা করা হয়। মুরারী থানায় আশ্রয় নেওয়া হিন্দুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো। যার ফলে বরিশাল এবং আশে পাশে থেকে প্রায় সাত/আট লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন এবং সে কারণে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় গড়ে ওঠে বরিশাল কলোনি।

১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা ছিল হিন্দু প্রধান অঞ্চল। সে কারণে কাশ্মীরের হজরত বাল মসজিদ থেকে পয়গম্বরের পবিত্র কেশ হিন্দুরা চুরি করেছে এই মিথ্যা অজুহাতে গণহত্যা চালিয়ে খুলনা হিন্দুশূন্য করা হলো। খুলনা ছিল শিল্পসমৃদ্ধ শহর। ভৈরব নদের লঞ্চঘাট দিয়ে যে হিন্দুরা ভারতে পালিয়ে এলেন তাদের গলা কাটা মৃতদেহ পায়ে ঠেলে নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে আসতে হয়েছিল, যার সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি।

ওই বছরই শুরু হয়েছিল নারায়ণগঞ্জের গণহত্যা। ঢাকেশ্বরী কটনমিল এবং লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের কয়েক হাজার হিন্দু শ্রমিককে আটকে রেখে, না খেতে দিয়ে, জল না দিয়ে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করা হয়, সঙ্গে চলে অবাধ লুট, ধর্ষণ আর গণহত্যা। ১৯৬৪ সালে রাজশাহি, সিলেট, ময়মসিংহ আর নারায়ণগঞ্জের হিন্দু সমাজকে খতম করে ফেলা হয়।

প্যালেস্তাইন, ইরানে গণহত্যা হলে কলকাতায় বুদ্ধিজীবী বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গে মৌলবাদীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হিন্দুদের জন্য কোনও প্রতিবাদ এরা করেন না। পৃথিবীতে এই রকম আত্মঘাতী জাতি আছে কিনা জানা নেই।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনা আর বাংলাদেশের রাজাকারদের সমর্থনে জামাত-উল-মুজাহিদিন আর স্থানীয় ইমামরা হিন্দু মহিলাদের গনিমতের মাল হিসাবে ঘোষণা করে। হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ করার জন্য পৃথক বাহিনী তৈরি করে। প্রায় চার লক্ষ হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ করা হয় যাদের অনেকে পরবর্তী সময়ে ভারতে আসতে বাধ্য হন। হিন্দুর সম্পত্তিকে শত্রুর সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তানি সেনা অপারেশন 'সার্চ লাইট' নামে এক ভয়ংকর অত্যাচার চালিয়ে প্রায় তিন লক্ষ হিন্দু হত্যা করে যার মূল নায়ক ছিলেন বাংলার কসাই টিক্কা খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদের নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয় এবং ৩০০ বছরের পুরাতন ঢাকার রমনা কালীবাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর হিন্দু জনসংখ্যা ১৬ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ১২ শতাংশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ৩ লক্ষ হিন্দু হত্যা করা হয়। বাকিরা প্রাণ ভয়ে ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে গুজব রটানো হয় যে ভারতে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই অজুহাতে মৌলবাদীরা বাংলাদেশ জুড়ে হাজার হাজার হিন্দু হত্যা করে তাণ্ডব চালায়। হাজার হাজার হিন্দুর বাড়ি ঘর ভেঙে ফেলা হয়, পুড়িয়ে দেওয়া হয়। যার ফলশ্রুতিতে আবার হাজার হাজার হিন্দু ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে শরণার্থী হিসাবে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তখন ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবার ভয়ে মুখ খোলেনি। পরবর্তীকালে ২০০১/ ২০১৩/২০১৪/

২০১৬ সালে ধারাবাহিক ভাবে বিএনপি জামাত জে.এম.বি.-সহ বাংলাদেশের মৌলবাদী মুসলমানরা লাগাতার হিন্দু নির্যাতন, হিন্দু হওয়ার অপরাধে বাচ্চা মেয়েদের ধর্ষণ, হিন্দু মন্দির ধ্বংস, পুরোহিত হত্যা-সহ হিন্দুদের ওপর পৈশাচিক ভাবে গণ হত্যা চালিয়ে গেছে। যার ফলে লাগাতার ভাবে প্রায় সর্বমোট ৩ কোটি হিন্দু ভারতে শরণার্থী হয়ে চলে আসতে বাধ্য হন।

সম্প্রতি রোহিঙ্গা মুসলমানদের হিন্দু হত্যা সম্বন্ধে অভিযোগ প্রকাশ্যে এলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল এই বিষয়ে তদন্ত করে জানায় যে, ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রাখাইন প্রদেশে কালো মুখোশ পরা রোহিঙ্গা সন্ত্রাসবাদীরা ১০০ জন হিন্দুকে হত্যা করে এবং তদন্তকালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল একটি গ্রামে গণকবর খুঁড়ে ৫৩ জন হিন্দু পুরুষ, নারী ও শিশুর পচাগলা দেহের সন্ধান পায়। খবরটি ২৩ মে টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপরেও আমরা বারুইপুরে এই ঘৃণ্য প্রজাতির জন্য বাসস্থান বানিয়ে দিচ্ছি, আহারের ব্যবস্থা করছি। আরও একটা বিষয় আমাদের জানা দরকার যে রোহিঙ্গাদের অলিখিত সংবিধান হলো ২ : ১০, অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী বাদে ১০ জন সন্তান ধারণ করতে হবে। তাহলে বিপদটা বুঝছেন তো— আমরা কীভাবে নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছি।

১৯৪৬ সালে কলকাতার যে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং হয়েছিল সে সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম কোনও খবর রাখে না। কিন্তু পরম শ্রদ্ধেয় মিলন ভৌমিক এই ঘটনা নিয়ে একটি সিনেমা তৈরি করেন এবং বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির কৃপায় নতুন প্রজন্মও জানতে পারছে সেই সময়কার ভয়ানক সেই কাহিনি। যদিও আমরা সচেতন বা সজাগ হইনি। কারণ আমাদের নেতা ও ধর্মগুরুদের অধ্যাত্মজ্ঞান অনেক আছে কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে। যার ফলে আমরা অতীত থেকেও শিক্ষা নিতে ভুলে গেছি।

এন. আর. সি. নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ এমনকী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত মতুয়া সম্প্রদায়ের এক অংশ পর্যন্ত খুব চিন্তিত। তারা গেল গেলে করে রেল অবরোধ করছে। এমনকী অসম পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে বিরোধিতা করার জন্য। কিন্তু অসমের বাংলাভাষী কবি, লেখক থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবীরা এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলছেন না। কারণ তারা জানেন যে এর জন্য পূর্ববঙ্গের একজন হিন্দু উদ্বাস্তুকেও ভারত ছাড়া হতে হবে না। 'নাগরিকত্ব বিল ২০১৬' সংসদে পাকা হয়ে গেলে বাঙ্গালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব অসম-সহ সারা দেশে পাকা হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলো যে, তৃণমূল ও কংগ্রেসিরা সংসদে সেই বিল পাশ হতে দিচ্ছে না। তারা শরণার্থী হিন্দুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

আমরা অবাক হয়ে দেখি যে প্যালেস্তাইন, ইরানে গণহত্যা হলে কলকাতায় বুদ্ধিজীবী বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গে মৌলবাদীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হিন্দুদের জন্য কোনও প্রতিবাদ এরা করেন না। পৃথিবীতে এই রকম আত্মঘাতী জাতি আছে কিনা জানা নেই।

একটা বিষয় প্রায় মনে পড়ে যে, পূর্ববঙ্গ থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছেন তারা ভবিষ্যতে উদ্বাস্তু হয়ে কোথায় যাবেন? পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী-সহ শাসকদলের কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে যে ১৯৪৬ সালের সেই ভয়ানক ইতিহাস আবার ফিরে আসছে। সংগঠিত মুসলমান শক্তি আবার গ্রেট বেঙ্গল কিলিংয়ের ডাক দেবে, আর আমরা গোপাল পাঁঠার আশায় প্রাণ রক্ষা করব। নিজেরা সংগঠিত না হলে সবসময় গোপাল পাঁঠা এসে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। ইতিমধ্যে একজন পাকিস্তানপ্রেমী কলকাতার মেয়রের পদে বসেছেন।

অসমের এন. আর. সি. রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, যারা বাদ গিয়েছে তাদের মধ্যে ৩৭ লাখের কিছু বেশি বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। এ রাজ্যে ডান, বাম সরকারের ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষার জন্য সংখ্যালঘু তোষণের ফলে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী মূল জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হয়ে গেছে। যার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সরকারের অনেক সিদ্ধান্ত এখন তাদের হাতে। যেমন ইমাম ভাতা, হজটাওয়ার, সংখ্যালঘু ভবন, সংখ্যালঘু ছাত্র বৃত্তি, কবর স্থান উন্নয়ন, মাদ্রাসা উন্নয়ন গীতাঞ্জলি আবাস যোজনা সহ পাঠ্য পুস্তকেও ইসলামিকরণের অপচেষ্টা অবধি চলছে। কতদিন এ জিনিস চলবে— ওপার বাংলায় সংখ্যালঘু নিধন আর এপার বাংলায় সংখ্যালঘু তোষণ। আর যেদিন আমরা এখানেও সংখ্যালঘু হবো সেদিন আবার আমাদের উদ্বাস্তু হতে হবে না তো? ▌

মালদা ও গাজোলে এনআরসি-র আলোচনা সভা

গত ২৫ নবেম্বর মালদহ জেলার গাজোলে নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে কদুবাড়ির জয়শ্রী লজে নাগরিকপঞ্জি বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, গনিখান চৌধুরী ইনসস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি-র সৌমিত্র সরকার এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক সাধন কুমার পাল। সভায় গাজোল ও সন্নিহিত এলাকা থেকে ৩৫০ জন বিশিষ্ট মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সভার বিষয় ছিল— নাগরিকপঞ্জি কী ও কেন, তথ্য, বিভ্রান্তি এবং আমরা।

শ্রীসেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ ও অসম রাজ্য অবৈধ অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে গেছে। তারা দুই রাজ্যের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেকে প্রভাবিত করছে। ২০১৬ সালে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলআনার চেষ্টা করেছে কিন্তু তৃণমূল ও কংগ্রেস সাংসদরা বিরোধিতা করেছে। তারা শরণার্থী হিন্দুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। নাগরিকপঞ্জির উদ্দেশ্য শুধু অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা।' বক্তারা উপস্থিত নাগরিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী।

২৬ নভেম্বর মালদা শহরের সানিউল্লা মঞ্চে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে একই বিষয়ের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শহরের ৩০০ জন বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। উপরোক্ত বক্তারা এখানেও বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা শ্রীমতী মউ দে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গের সংযোজক রাজু কর্মকার।

কলকাতায় এবিভিপি-র জাতীয় ছাত্র মহামিছিল

গত ৩০ নভেম্বর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় মহামিছিলের আয়োজন করা হয়। হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে

আসা ছাত্র-ছাত্রীর মিছিল রাণি রাসমণি রোডে এসে জমায়েত হয়। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলে বেশ কিছুক্ষণ ধর্মতলা এলাকা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মিছিল থেকে দাবি তোলা হয় দারিভিট হাইস্কুলে পুলিশের গুলিতে দুই ছাত্র রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের হত্যার বিচার ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকপঞ্জিকরণ করতে হবে ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার করতে হবে। জমায়েত সভায় নিহত তাপস ও রাজেশের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তাপস ও রাজেশের মাতৃদ্বয়। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন এবিভিপি-রাজ্য সহ-সভাপতি সুবীর হালদার। তাপসের বোন মউ তার ভাষণে জানায় তার সঙ্গে স্কুলের বহু ছাত্র-ছাত্রী সেদিন পুলিশের গুলি চালানোর প্রত্যক্ষদর্শী। বক্তব্য রাখেন পরিষদের সুনীল অম্বেদকর, আশিস চৌহান, অবিনাশ পাণ্ডে, নরেন্দ্র সপাং প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

১০৮ এর গুরুত্ব

রাজদীপ মিশ্র

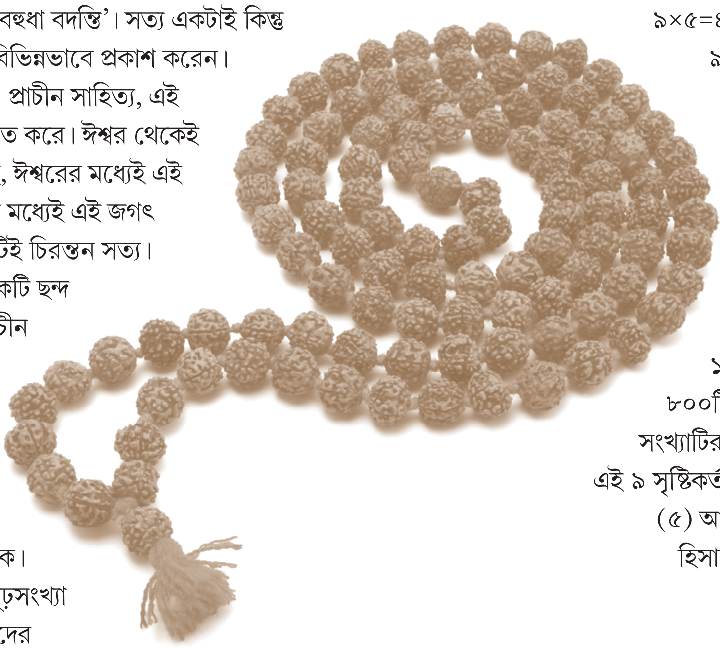

'একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। সত্য একটাই কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেন। ভারতীয় জ্ঞান ভাণ্ডার, প্রাচীন সাহিত্য, এই বিষয়টিকেই প্রতিধ্বনিত করে। ঈশ্বর থেকেই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, ঈশ্বরের মধ্যেই এই জগৎ রয়েছে, ঈশ্বরের মধ্যেই এই জগৎ বিলীন হয়ে যায়— এটিই চিরন্তন সত্য।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি ছন্দ তথা নিয়মে চলে। প্রাচীন ভারতীয় মুনি-ঋষিরা এই বিষয়টি জানতেন। এই ছন্দই হলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র সংখ্যা ১০৮-এর প্রতীক। এই আধ্যাত্মিক এবং গূঢ়সংখ্যা ১০৮ প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে ছিল খুবই পবিত্র। আজও সেই ধারা সমানে চলে আসছে। সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ১০৮-কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(১) ভারতীয় পুরাণ মতে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ১০৮ সংখ্যাটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। এক মিনিটে আমরা সাধারণত ১৫ বার শ্বাসক্রিয়া চালাই। সেই হিসাবে এক ঘণ্টায় ৯০০ বার এবং ১২ ঘণ্টায় ১০ হাজার বার এবং ২৪ ঘণ্টায় (১০,৮০০×২) ২১,৬০০ বার। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি ১২ ঘণ্টা নিজের কাজের জন্য রাখা যায়, তাহলে বাকি ১২ ঘণ্টা একজন ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করতে পাবেন। তাই একজন ব্যক্তি সর্বাধিক ১০,৮০০ বার ইষ্টনাম জপ করতে পারেন। কেউ যদি এই জপের ১০০ শতাংশ উপকার পেতে চায়, তাহলে তাকে ১০৮ বার জপ করলেই হবে। তাই একটি জপমালাতে ১০৮টি পুঁতি থাকে।

(২) জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী আমাদের ছায়াপথে ২৭টি নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। প্রত্যেকের চারটি করে দিক আছে। অর্থাৎ ২৭×৪=১০৮। অন্যভাবে বলতে গেলে ১০৮ সংখ্যাটি সমগ্র ছায়াপথকে আবৃত করে।

(৩) হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ৯ সংখ্যাটি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রতীক। গাণিতিক দিক থেকে ৯ একটি অদ্ভুত সংখ্যা।

৯×১=৯

৯×২=১৮ (৮+১=৯)

৯×৩=২৭ (৭+২=৯)

৯×৪=৩৬ (৬+৩=৯)

৯×৫=৪৫ (৫+৪=৯)

৯×১২=১০৮ (১+০+৮=৯)

(৪) হিন্দু ধর্মে ৯ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। ৯ এর গুরুত্ব মাথায় রেখে ঋষি ব্যাসদেব ৯টি পুরাণ এবং ১০৮টি মহাপুরাণ (উপনিষদ) রচনা করেছিলেন। মহাভারতে ১৮টি অধ্যায় আছে। গীতাতে ১৮ অধ্যায় আছে এবং ১০,৮০০টি শ্লোক আছে। ১০৮ এই সংখ্যাটির অঙ্কগুলির যোগফল ৯ এবং এই ৯ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্কিত।

(৫) আমাদের বেদ সূর্যকে দেবতা হিসাবে বিবেচনা করে। সূর্যের ১২টি রাশিচক্র আছে। যজুর্বেদে সূর্যকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রার্থনার জন্য ১০৮ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ। ১২ (রাশিচক্র) × ৯ (ব্রহ্মার প্রতীক) = ১০৮ (১+০+৮=৯)। তাই ১০৮ খুবই পবিত্র সংখ্যা।

(৬) ভারতীয় পুরাণ মতে চারটি যুগ আছে। (ক) সত্যযুগ— ১৭২,৮০০ বছর নিয়ে সত্যযুগের ব্যাপ্তি (১+৭+২+৮=১৮) (১+৮=৯)

(খ) ত্রেতাযুগের ব্যাপ্তি ১২৯৬০০০ বছর (১+২+৯+৬=১৮) (১+৮=৯)।

(গ) দ্বাপর যুগের ব্যাপ্তি ৮৬৪০০০ বছর (৮+৬+৪=১৮) (১+৮=৯)।

(ঘ) কলিযুগের ব্যাপ্তি ৪৩২০০ বছর (৪+৩+২=৯)।

(৭) **আকাঙ্ক্ষা :** কথিত আছে যে মনুষ্যজাতির ১০৮ প্রকারের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা থাকে।

(৮) **মিথ্যা :** কথিত আছে যে, মনুষ্যসমাজ ১০৮ প্রকার মিথ্যা বলে।

(৯) **বিভ্রান্তি :** বলা হয় যে মানুষের ১০৮ প্রকার বিভ্রান্তি হয়।

(১০) **সংস্কৃত বর্ণমালা :** সংস্কৃত বর্ণমালায় ৫৪ টি বর্ণ আছে। প্রতিটি বর্ণের পুরুষ এবং স্ত্রী সত্তা আছে— শিব এবং শক্তি। ৫৪×২=১০৮।

(১১) **প্রাণায়াম :** প্রশান্ত চিত্তে কোনও ব্যক্তি যদি ধ্যানস্থ অবস্থায় দিনে একবার ১০৮ বার শ্বাসক্রিয়া চলায়, তাহলে তার মন এক নতুন শক্তি পায়।

(১২) **পঞ্চভুজ :** একটি পঞ্চভূজের দুটি পাশাপাশি রেখা মিলিত হয়ে যে কোণ উৎপন্ন করে তা ১০৮ ডিগ্রির কোণ।

(১৩) **মর্মবিন্দু :** আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলে যে, আমাদের শরীরে ১০৮টি মর্মবিন্দু বা মর্মস্থান (শরীরের মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু) আছে। সেখানে আমাদের চেতনা এবং দৈহিক ইচ্ছা মিলিত হয়ে আমাদের জীবনে শক্তির সঞ্চার করে। ১০৮টি লিংক পয়েন্ট বা মর্মবিন্দু পরস্পরের সঙ্গে ১০৭টি সন্ধি (জয়েন্ট) দ্বারা একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

(১৪) **অনুভূতি :** কথিত আছে যে, আমাদের ১০৮ রকমের অনুভূতি আছে— ৩৬টি অতীত, ৩৬টি বর্তমান এবং ৩৬টি ভবিষ্যৎ কালের সঙ্গে জড়িত।

(১৫) **গঙ্গা নদী :** পবিত্র গঙ্গা নদী ১২ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ (৭৯ থেকে ৯১) এবং ৯ ডিগ্রি অক্ষাংশ (২২ থেকে ৩১) পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ১২×৯= ১০৮।

(১৬) **গ্রহ এবং রাশিচক্র :** জ্যোতিষশাস্ত্রে ১২টি রাশিচক্র এবং ৯টি গ্রহ আছে। ১২×৯= ১০৮।

(১৭) **জ্যোতিষশাস্ত্র :** জ্যোতিষশাস্ত্রে বৈদিক ঋষিরা হিসাব কষে দেখেছেন যে, (ক) পৃথিবী এবং চন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব হলো চন্দ্রের ব্যাসের ১০৮ গুণ।

(খ) পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে দূরত্ব হলো সূর্যের ব্যাসের ১০৮ গুণ।

(গ) সূর্যের ব্যাস হলো পৃথিবীর ব্যাসের ১০৮ গুণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পৃথিবী এবং চাঁদ পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে যে গড় দূরত্ব পরিমাপ করা হয়েছে তা আশ্চর্যজনকভাবে বৈদিক ঋষিদের হিসাবের প্রায় কাছাকাছি।

(১৮) **কৃষ্ণের গোপী :** কৃষ্ণকথায় বলা হয় কৃষ্ণের গোপীর সংখ্যা ১০৮।

(১৯) **১, ০, ৮ :** কেউ কেউ বলেন যে, ১ হলো ঈশ্বরের প্রতীক। ০ হলো আধ্যাত্মিক অভ্যাসের পরিপূর্ণতা এবং ৮ হলো অসীমের প্রতীক।

(২০) **ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ :** কেউ কেউ বলেন যে, ঈশ্বর প্রাপ্তির ১০৮টি পথ আছে।

(২১) **ক্ষুদ্রাংশ :** ১০৮ সংখ্যাটি ২, ৩, ৪, ১২ দিয়ে বিভাজ্য। তাই কিছু কিছু মালার পুঁতির সংখ্যা ৫৪, ৩৬, ২৭ এবং ৯।

(২২) **হিন্দুত্ব :** হিন্দু ধর্ম অনুসারে ১০৮ জন দেব-দেবীর অস্তিত্ব রয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেন যে, প্রত্যেক দেব-দেবীর আবার ১০৮টি করে নাম আছে।

(২৩) **নৃত্য :** ভারতীয় সংস্কৃতিতে ১০৮ প্রকার নৃত্যকলা রয়েছে।

শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মেই নয়, ১০৮ সংখ্যাটির গুরুত্ব অন্যান্য ধর্মমতেও আছে। জৈন ধর্মমতে মোট ৫ প্রকার গুণ (১২+৮+৩৬+২৫+২৭) সম্মিলিত ভাবে আমাদের দেহে থাকে। শিখ ধর্মমতাবলম্বীরা একটি উলের দড়ির ওপর ১০৮টি গাঁট (পুঁতি নয়) সংবলিত মালা জপ করে। কিছু কিছু বৌদ্ধ একটি আখরোটের ওপর ১০৮টি ছোটো বুদ্ধমূর্তি খোদাই করেন সৌভাগ্যের প্রতীক রূপে। চীনদেশের বৌদ্ধ এবং তাও ধর্মাবলম্বীরা ১০৮টি পুঁতি সংবলিত মালা ব্যবহার করেন। এই মালাটির নাম 'শু-চু'। মালার পুঁতিগুলি সমান তিন ভাগে (৩৬×৩) বিভক্ত। চীনদেশের জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে মহাকাশে ১০৮টি পবিত্র তারা আছে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের পরম্পরা অনুয়ায়ী ১০৮ সংখ্যাটির একটি অপরিসীম গুরুত্ব আছে।

(সৌজন্য ইটারনাল ট্যালেন্টেড ইন্ডিয়া, প্রকাশক : রামকৃষ্ণ মঠ, হায়দরাবাদ)

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
করুন
উন্নতি করুন
DRS INVESTMENT
Contact :
9830372090
9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
uti UTI Mutual Fund
HDFC MUTUAL FUND
SBI MUTUAL FUND A partner for life.

সুবর্ণবিহার ও পিণ্ডবিহার

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে, কৃষ্ণনগর-স্বরূপগঞ্জ বাস-পথের ধারে অবস্থিত সুবর্ণবিহার একটি প্রাচীন স্থান। নবদ্বীপ মণ্ডলের গোক্রম-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, যেহেতু বিহার অর্থে বৌদ্ধ মঠ বোঝায়, সেই হেতু পাল রাজবংশের আমলে বা তারও আগে এখানে কোনও বৌদ্ধবিহার ছিল। মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে সুবর্ণদ্বীপ নামে এক বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন শিলালিপিতে। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর সুবর্ণদ্বীপের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। অনুমান, সুবর্ণদ্বীপ ও সুবর্ণবিহার একই স্থান। পক্ষান্তরে, কিছু গবেষকের বক্তব্য, কোনও সুবর্ণ রাজার নামানুসারে সুবর্ণবিহার নাম হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থ 'গোবিন্দচন্দগীত'-এ বৌদ্ধ নৃপতি 'সুবন্নচন্দ রাজার' উল্লেখ আছে। আবার আর এক বৌদ্ধ সামন্তরাজা সুবর্ণচন্দ্র নাকি চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করতেন। এই দুই রাজাই পাল রাজাদের সমকালীন বলে প্রকাশ। এইসব সুবর্ণ রাজাদের মধ্যে কোনও একজন ছিলেন কুমোরবংশের। শত্রুরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবে, খবর পেয়ে সেই রাজা কুলগুরুর শরণাপন্ন হন। গুরু তখন তড়িঘড়ি নিজের তত্ত্বাবধানে প্রাসাদের নীচে একটা বড় পাতালঘর তৈরি করেন। যে ঘরে ঢোকা ও বেরোনোর রাস্তা দুই দিকে ছিল। উপরন্তু গুরুদেবই সেই দুটি পথের হদিশ জানতেন। যখন শত্রুসেনা রাজ্য আক্রমণ করল, গুরুর নির্দেশে রাজা সপরিবারে সেই পাতালঘরে চলে গেলেন। কিন্তু গুরুদেব প্রবেশ করতে গেলে, পিছন থেকে সৈন্যদের আক্রমণে নিহত হলেন। যেহেতু গুরুদেব ছাড়া আর কেউ বেরিয়ে আসার রাস্তা জানতেন না, ফলে রাজাও আটকে পড়লেন। সপরিবারে তাঁর পাতালসমাধি হলো।

এখন সুবর্ণবিহার এক নগণ্য গ্রাম মাত্র। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি নবনির্মিত গৌড়ীয় মঠ। মঠে গৌর-নিতাই, রাধা-কৃষ্ণ ও জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম বিগ্রহ অধিষ্ঠিত। মঠের পাশে যাঁতার অর্ধাংশের আকারে একটা এবং দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৩ ফুট আরেকটা কালো পাথর পড়ে রয়েছে। পুরনো কোনও ইমারতের অংশ ৭ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১ ফুট প্রস্থ একটা পাথরের চৌকাঠও দেখা যায়। এছাড়া কারুকার্যমণ্ডিত বিরাট স্তম্ভের আধখানাও নজরে পড়ে। লোকে বলে, ওগুলো সুবর্ণবিহারের স্মারক।

প্রসঙ্গত, প্রাচীন বৌদ্ধবিহারগুলোতে প্রায়ই বিতর্কসভার আয়োজন করা হত। এমনকী, বিহারে আগত তীর্থযাত্রীরাও কখনও তর্কসভার আহ্বান করত। এইসব সভায় বৌদ্ধ মহাযানপন্থীরা মাথায় খোঁচা-তোলা বা সূচ্যগ্র শিরোস্ত্রাণ পরে যোগদান করতেন। তাদের সংস্কার বা বিশ্বাস ছিল, ওই টুপি পরে সমালোচনা সভায় যোগ দিলে জয় অবশ্যম্ভাবী। একবার প্রাচীন পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম শহরের পিণ্ডবিহারে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সেখানে এক রাতে সহসা একদল বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী এসে আশ্রয় নিলেন। তারা জানান, পরদিন সকালে আবাসিক ভিক্ষুদের সঙ্গে তারা বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করবেন। শুনে বিহারের ভিক্ষুরা অতিশয় আতান্তরে পড়লেন। যদি তারা হেরে যান, তাহলে বিহারের বদনাম তো হবেই, অধিকন্তু তারা বিতাড়িতও হতে পারেন। দুশ্চিন্তায় তাদের ঘুম এলো না। রাত ক্রমে বাড়তে লাগল। তখন মাঝরাতে হঠাৎ কোথা থেকে একটা বুড়ি এসে বিহারে ঢুকে পড়ল। তাকে কেউ কোনওদিন দেখেনি। বুড়ি ভিক্ষুদের কাছে এসে বলল, 'শোনো বাছারা, বৃথা ভয় পেও না। যদি তোমরা কাল খোঁচা-তোলা শিরোস্ত্রাণ পরে তর্কযুদ্ধে শামিল হও, তাহলে কেউ তোমাদের হারাতে পারবে না।' বলেই বুড়ি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পরদিন আবাসিক ভিক্ষুরা সূচ্যগ্র শিরোস্ত্রাণ পরে বহিরাগতদের সঙ্গে বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করে, অনায়াসে জয়লাভও করেন। ■

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

Email : swastika 5915@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

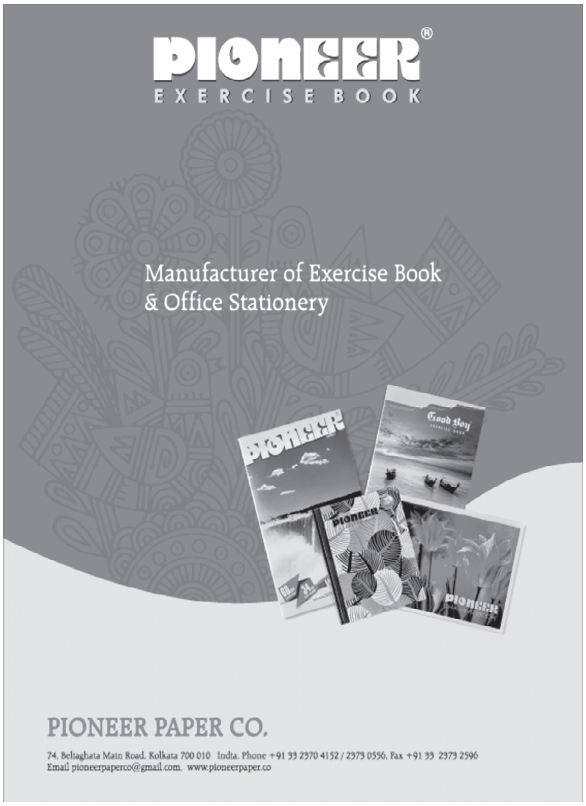

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

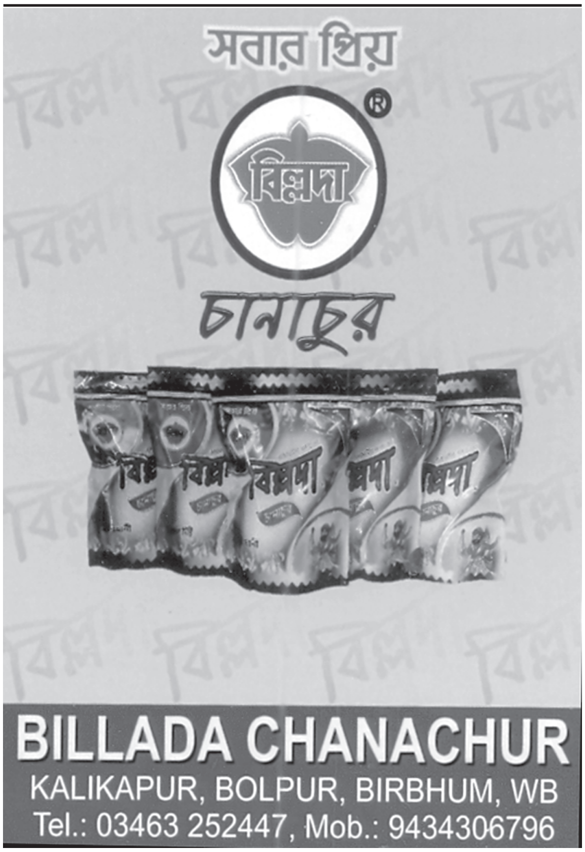

বিশেষ প্রতিবেদন

সেকালের শ্রেষ্ঠী থেকে আজকের ব্যবসায়ী

সন্দীপ সিংহ

ভারতে যারা ব্যবসা করেন তাদের অধিকাংশের মধ্যে একটি যোগীসুলভ মানসিকতা আছে। মফস্‌সল শহরের ছোটোখাটো দোকানদার থেকে শুরু করে সাধারণ ঠেলাওয়ালাদের মধ্যেও এই মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। ধরা যাক কেউ এক কেজি চাল কিনলেন। সাধারণত দোকানদার দাঁড়িপাল্লায় ওজন সঠিক হওয়া সত্ত্বেও কিছু চাল অতিরিক্ত দিয়ে দেন। এর কারণ কী? দোকানদারের ভাবনা সম্ভবত এই খাতে বয়, 'দাঁড়িপাল্লায় ওজন ঠিক আছে কিন্তু তবুও কোথাও ভুল হয়ে থাকতে পারে। কিছু চাল অতিরিক্ত দিয়ে দেওয়াই ভালো।' এই ধরনের ঘটনা ভারতে আকছার ঘটে। হয়তো দোকানদার নিজেও জানেন না, কেন তার মনে হয় 'কোথাও ভুল হয়ে থাকতে পারে'। তার বাপ-ঠাকুর্দা এইভাবে ব্যবসা করেছেন, তিনিও করে যাচ্ছেন। শুধু ছোটো ব্যবসায়ীরাই নয়, বড়ো বড়ো শিল্পপতিদেরও এই ধরনের মানসিকতা দেখা যায়।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কোনওদিনই একা পুরো বাজার দখল করার লক্ষ্যে ব্যবসা করেননি। বরং তারা মনে করতেন সবাইকে নিয়ে বাজার সম্প্রসারণ করতে পারলে বাণিজ্যের পরিধি আরও বাড়বে। উদাহরণস্বরূপ, ঘনশ্যামদাস বিড়লার নাম করা যেতে পারে। তিনি যত তরুণ উদ্যোগপতিকে বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভের পথ বাতলে দিয়েছেন, বোধকরি আর কেউ তত দেননি। সম্ভবত এই কারণেই ভারতের কোনও ভাষায় ইংরিজি ব্ল্যাকমেলের কোনও প্রতিশব্দ নেই। প্রাচীন ভারতে ব্যবসায়ীদের বলা হতো শ্রেষ্ঠী। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। তারপর ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে মুসলমানদের পদার্পণ ঘটল। তাদের পরে এল ব্রিটিশরা। এরা যে শুধু বাণিজ্যের নামে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা দখল করল তাই নয়, ভারতের মহান আত্মাকেও ধ্বংস করার চেষ্টায় মেতে উঠল।

স্বাধীনতা লাভের পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু'র নীতি এবং মানসিকতাও ভারতের ব্যবসায়ীসমাজের চরিত্রবদলের জন্য দায়ী। কথাটা বিশদে বোঝার জন্য একটা পুরনো ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। একবার নেহরু জে. আর. ডি. টাটার সঙ্গে লাঞ্চ করছিলেন। খেতে খেতে টাটা বলেন, 'সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্য- ক্ষেত্রগুলিকেও লাভজনক করে তোলা দরকার।' তাতে নেহরু বলেছিলেন, 'লাভ একটা অত্যন্ত কুরুচিকর কথা। আশাকরি এখন এসব কথা বলে তুমি আমাদের খাওয়াটা নষ্ট করবে না।' ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর এহেন কথা শুধু ভারতীয় বাণিজ্যের সম্ভাবনাকেই নষ্ট করেনি, তাঁর মানসিকতায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও যারপরনাই হতাশ হয়েছিলেন।

> **বিশ্বের অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীদের থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আলাদা। স্মরণাতীতকাল থেকে তাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে বিভিন্ন ভাবে দেশের উপকার করে চলেছেন। তাঁরা সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ। অবশিষ্ট বিশ্ব ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই দুটি গুণ এখনও খুঁজে পায়নি।**

আর একটি ঘটনা। দেশভাগের পর সিন্ধুপ্রদেশের পুরোটাই পাকিস্তানে চলে যায়। ভাই প্রতাপ দয়াল দাস (১৪ এপ্রিল ১৯০৮-৩০ আগস্ট ১৯৬৭) কচ্ছের মহারাওয়ের দেওয়া ১৫,০০০ একর জমিতে সিন্ধু রিসেট্‌লমেন্ট করপোরেশন স্থাপন করেন। মাত্র তিন বছর সময়ে তিনি তিনটে শহরের জন্ম দেন। শহরগুলির নাম আদিপুর, গান্ধীধাম এবং কাণ্ডলা। শুধু তাই নয়, করাচি বন্দর হাতছাড়া হওয়াতে ভারতের যে ক্ষতি হয়েছিল তার পরিপূরক হিসেবে তিনি কাণ্ডলা বন্দরের নকশা তৈরি করেছিলেন।

ভাই প্রতাপ দয়াল দাস ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোধাপুরুষ। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের কোষাগারে প্রভূত অর্থ জুগিয়েছেন, নিজের বাড়ির বেসমেন্টে আত্মগোপন করে লড়াই করেছেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে— আবার গান্ধীজী নেহরু প্রমুখ নেতা সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদে গেলে তাদের নিজের বাড়িতে রেখে যথাযথ আপ্যায়নও করেছেন।

কিন্তু বিনিময়ে কী পেয়েছেন? বিদেশ থেকে ইমপোর্টেড জিনিসপত্র নিজের কাছে রাখার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সামান্য ঘটনা কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে জটিল হয়ে দাঁড়াল। তার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা দায়ের করা হয় ১৯৬০ সালে। বছরের পর বছর মামলা চলতে থাকে। ১৯৬৫ সালে মামলার রায় বেরোয়। পাঁচ বছর কারান্তরালে কাটিয়ে এবং সেখানে অমানুষিক পরিশ্রম করার ফলে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। কারাবাসের একেবারে শেষ দিকে তাঁকে বম্বে পুরসভা পরিচালিত সেন্ট জর্জেস হাসপাতাল ভর্তি করা হয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার, পরিবারের লোকজন দু' সপ্তাহে একবার হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যেতে পারত। ১৯৬৭ সালের ৩০ আগস্ট ভাই প্রতাপ লন্ডনে মারা যান। তখন তার বয়েস মাত্র ৫৯ বছর।

ব্যবসায়ীদের প্রতি জওহরলাল নেহরুর উপেক্ষা এবং নীচু নজরের বহিঃপ্রকাশ আমরা যেমন ভাইপ্রতাপ দয়াল দাসের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, ঠিক তেমনই পাই টিটি কৃষ্ণমাচারীর ক্ষেত্রেও। মুদ্রা কেলেংকারিতে জড়িত থাকার দায়ে ১৯৫৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি টি.টি. কৃষ্ণমাচারী অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯৬২ সালের নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হলে নেহরু তাকে অর্থমন্ত্রক ছাড়া যে-কোনও একটি ক্যাবিনেট মন্ত্রক বেছে নিতে বলেন। নেহরু'র প্রস্তাবের কোনও জবাব না দেওয়ায় তাকে মন্ত্রকহীন ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রীসভায় কিছুদিন থাকতে হয়। পরে অবশ্য তাকে অর্থমন্ত্রকেই ফিরিয়ে আনেন নেহরু। এবং ১৯৬৬ পর্যন্ত তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। টি.টি. কৃষ্ণমাচারী ছিলেন ব্যবসায়ী, টিটিকে গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা। তবে কংগ্রেস দলে থাকার ফলেই তিনি সেবার বেঁচে গিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়বার অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

সেই সময় সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্য বহু ব্যবসায়ীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল। এমনই এক ব্যবসায়ীর নাম দান সিংহ বিস্ত (১৯০৬-১৯৬৪)। তিনি ছিলেন একাধারে ব্যবসায়ী, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সমাজহিতৈষী। অথচ তাঁকে তাঁর কারখানা প্রায় জলের দরে বিক্রি করে দিতে হয়, কারণ ঋণের টাকায় কেনা বিদেশি যন্ত্রপাতি সরকার তাঁকে কলকাতা বন্দর থেকে ছাড়াতে দেয়নি। এই শোকেই পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নীচু নজরে দেখলেও, বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্রতি নেহরু'র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। আই বি এম যাতে ভারতে ব্যবসা করতে পারে তার জন্য নেহরু ১৯৫১ সালে বিশেষ ব্যবস্থা নেন। সে সময় ভারতীয় বাজারের আশি শতাংশের দখল ছিল আই বি এম-এর হাতে। ভারতীয় বাজারে কী বিক্রি হবে, না হবে— তা নিয়ন্ত্রণ করত আই বি এম। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে তারাই ছিল সর্বেসর্বা। বিদেশ থেকে পুরনো মেশিন নিয়ে এসে আই বি এম আগে চলনসই গোছের করে তুলত, তারপর চড়া দামে লিজ দিত সরকারকে।

বিক্রম সারাভাইয়ের নেতৃত্বে সরকারের ইলেকট্রনিক্স কমিটি প্রথম এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করে। আই বি এম জানায়, সরকার দেশের সার্বিক ক্রমবিকাশের যে নীতি গ্রহণ করেছে, তারা সেই নীতি অনুসারেই কাজ করছে। বলা বাহুল্য, কারোর কাছেই এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক বলে মনে হয়নি। কিন্তু কংগ্রেস সরকার কোনও পদক্ষেপও করেনি। ১৯৭৭ সালে নির্বাচিত জনতা সরকার প্রথম বিদেশি মুদ্রা আইনের নির্দেশিকা মেনে আই বি এম-এর ভারতীয় অংশীদারিত্ব ২৬ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। আই বি এম এই সিদ্ধান্ত মানেনি। সেই কারণে ওই বছরেই আই বি এমকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ জারি করে সরকার।

ইন্দিরা গান্ধীর আমলেও পরিস্থিতি বিন্দুমাত্র বদলায়নি। আর এক গান্ধীবাদী ব্যবসায়ী এবং ইন্দিরা গান্ধীর বন্ধু বীরেন জে. শাহ্‌কে (১২ মার্চ ১৯২৬—৯ মার্চ ২০১৩) জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। বীরেন শাহ্‌ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মিসা আইনে। তাকে প্রথম ছ'মাস বম্বের আর্থার রোড জেলে রাখা হয়েছিল। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় তিহার জেলে। সেখানে তিনি তিন মাস ছিলেন। এই সময় বীরেন শাহের ছেলে রাজেশ শাহ একটি চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিটা লিখেছিলেন বম্বের এক প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা। চিঠির বক্তব্য ছিল এই রকম : বীরেন শাহ যদি জরুরি অবস্থা সমর্থন করে বিবৃতি দেন তাহলে তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মহার্ঘ্য কিছু লাইসেন্সও তিনি পেয়ে যেতে পারেন। বলা বাহুল্য, রাজেশ শাহ এই পরামর্শ কানে তোলার কথা ভাবেননি। এমনকী, বাবার সঙ্গে কথা বলার ভাবনাও তার মাথায় আসেনি।

লাইসেন্স রাজের স্রষ্টা ছিলেন নেহরু। এবং তাঁর এই সৃষ্টি কালক্রমে ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে। সর্বোপরি, যাবতীয় দুর্নীতির জন্য কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে শুধু ব্যবসায়ীদের। বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শ্রেষ্ঠীরা দানবে পরিণত হয়েছেন।

এতৎসত্ত্বেও, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কিন্তু দেশের পাশেই থেকেছেন। মাতৃভূমিকে সমৃদ্ধ করার কোনও সুযোগই তাঁরা ছাড়েননি। ১৯৯৮ সালে পোখরানে (পোখরান-২) আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পর আমেরিকার অনেকগুলি সংস্থা ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্বন্ধ ছিন্ন করেছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ২০০ ভারতীয় সংস্থা। এদের মধ্যে ছিল কিরলোসকর ব্রাদার্স, গোদরেজ অ্যান্ড বয়েস, লার্সেন অ্যান্ড টুবরো এবং ওয়ালচাঁদ-নাগার ইন্ডাস্ট্রিজের মতো বিশ্বখ্যাত সংস্থাও। দেশের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এইসব সংস্থা ক্ষতিস্বীকার করেছিল। সরকারকে দোষারোপ করে কোনও বিবৃতি তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

মানতেই হবে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীদের থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আলাদা। স্মরণাতীতকাল থেকে তাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে বিভিন্ন ভাবে দেশের উপকার করে চলেছেন। তাঁরা সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ। অবশিষ্ট বিশ্ব ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই দুটি গুণ এখনও খুঁজে পায়নি।

(সৌজন্য : অর্গানাইজার)

বিশেষ প্রতিবেদন

বাঙ্গালিকে দেশপ্রেম ভোলাতেই হবে!

ড. জিষ্ণু বসু

গত ২৩ নভেম্বর কাশ্মীরে নিরাপত্তা রক্ষীর গুলিতে মারা গিয়েছে লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গি নেতা আজাদ আহমেদ বুখারি, তার সঙ্গে আরও পাঁচজন জঙ্গি। এই জঙ্গিরাই গত ১৪ জুন শ্রীনগরে রাইজিং কাশ্মীরের প্রধান সম্পাদক সুজাত বুখারিকে হত্যা করেছিল। এই ঘটনার পরের দিন কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমে প্রথম পাতায় খবরের সঙ্গে অনন্তনাগে ওই জঙ্গি আজাদ আহমেদ মালিকের মৃতদেহের ছবি দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবার। ক্রন্দনরত একটি ছোট্ট শিশু। জঙ্গি পরিবারের প্রতি এমন সহানুভূতির ছবি ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশের দৈনিক সংবাদমাধ্যমে ভাবতেই পারা যায় না। 'দ্য হিন্দু' লেফট্ লিবারালদের মধ্যে অতি জনপ্রিয় ইংরেজি দৈনিক। সেখানেও প্রথম পাতায় খবর ''বুখারি হত্যার সন্দেহভাজনদের মধ্যে ছ'জনের মৃত্যু অনন্তনাগে।'' সঙ্গে অনন্তনাগের কুয়াশা ঘেরা সকালে প্রহরারত নিরাপত্তারক্ষীদের ছবি। জঙ্গি পরিবারের ছবি নেই। লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসবাদী পরিবারের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে এমন বেদনাবিধুর ছবি সারা ভারতবর্ষে বোধহয় একটিই সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে।

মৃত্যু সবসময় বেদনার। মৃতের পরিবারের স্বজন হারানোর বেদনা অবশ্যই যে কোনও সংবেদনশীল মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে। সেটা খাগড়াগড়ের আই.ই.ডি বিস্ফোরণে নিহত বাংলাদেশের জঙ্গি সাকিল আহমেদের বিধবা স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে দেখলেও হবে। আবার ২০০৮ সালের ২৬/১১ তারিখে মুম্বই শহরে লস্কর-ই-তৈবার সন্ত্রাসীরা ১৬৪ জন নিরাপরাধ মানুষকে মারার পরে যখন পাকিস্তানি আজমল কাসভের ফাঁসি হলো ২০১২ সালে, তখনও তার পরিবারের সদস্যদের এমনই বেদনাঘন অবস্থা হয়েছিল। আর মৃত যুবক পিতার সামনে বিধবা স্ত্রী শিশুপুত্রকে দেখলে মৃত মানুষটির কৃতকর্মের কথা কেউ ভাবেন না। তাই রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে ২৪ নভেম্বর আজাদ আহমদ মালিকের পরিবারের ছবি 'দ্য হিন্দু' বা ভারতের কোনও বড় সংবাদপত্র ছাপায়নি। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্রটি ছাপিয়েছে।

১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারির পরে কিন্তু এই সংবাদপত্রগুলির হৃদয়বত্তার কোনও প্রকাশ দেখা যায়নি। সেদিন এই আজাদ আহমদদের মৌলবাদী সংগঠনগুলি ঘোষণা করেছিল যে, কাশ্মীরি পণ্ডিতরা হলো কাফের, তাই তাদের উপত্যকায় থাকা চলবে না। সেদিন পণ্ডিতদের পরিচালিত ১৫০টি স্কুলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১০৩টি মন্দির ও ধর্মশালা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের দোকান, গুদাম আর কারখানায় চলল অবাধ লুঠপাট। এমন ১৪,৪০০টিরও বেশি লুঠপাটের ঘটনা পরে নথিবদ্ধ হয়েছে। ২০,০০০ বেশি মানুষের কৃষিজমি কেড়ে নিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো। উপত্যকার ৫৫ শতাংশ পণ্ডিতের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে ১১০০ জনের বেশি হিন্দু পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়েছিল। সমাজসেবী টিকালাল টাপ্লুকে দিনের বেলায় শ্রীনগরের রাস্তায় হত্যা করা হলো। নীলকণ্ঠ গঞ্জুকে মারা হলো করননগরে। নীলকণ্ঠের দেহ শ্রীনগরের রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকল। আজ যে অনন্তনাগের ছবি বাংলা কাগজের প্রথম পাতায় এসেছে, সেই অনন্তনাগের উকিল প্রেমনাথ ভাটকে নির্মম ভাবে হত্যা করল হিজবুল মুজাহিদিন। আজ তো কাশ্মীর উপত্যকা হিন্দুশূন্য, তাই ওই হিজবুল, ওই লস্কর এখন ভারতবর্ষের পক্ষে কথা বলা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের মারছে। সেদিন এই সব কাগজে টিকালাল টিপ্পু, নীলকণ্ঠ গঞ্জু বা প্রেমনাথ ভাটের মরদেহ নিয়ে পরিবারের ছবি ছাপা হয়েছিল?

কেবল কাশ্মীর কেন? ঘরের পাশে বাংলাদেশে যখন ২০০১ সালে হিন্দু নিধন যজ্ঞ হয়েছিল, যখন প্রতিদিন শত শত হিন্দু মা বোন ধর্ষিতা হচ্ছিলেন, মারা হচ্ছিল নিরাপরাধ মানুষদের, ভাঙা হচ্ছিল মন্দির, ২০০১ সালে ১৬ নভেম্বর চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র মুহুরীকে যখন তার বাড়ির উঠোনে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হয়েছিল, বাংলা কাগজের প্রথমপাতা তো দূরের কথা, ভেতরের পাতাতেও ওই সব বাংলাভাষীদের দুঃখের ছবি, মৃতদেহ নিয়ে প্রিয়জনের ছবি কখনো ছাপানো হয়েছে?

কিন্তু আহমেদ মালিকের পরিবারের করুণ ছবি ছাপানো হলো প্রথম পাতায়। এর একটি কারণ সর্বজন বিদিত। বাংলায় সংবাদমাধ্যমে অতিবামপন্থার প্রভাব অতি গভীর। স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে নিয়োগ থেকে ব্যুরোচিফে উত্তরণ পর্যন্ত ওই দীক্ষিত সমালোচক হওয়াটা এক অপরিহার্য যোগ্যতা। সেই ভাবনায় ভারতরাষ্ট্রেরই কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই! কীসের দেশপ্রেম? এমনই দীক্ষিত সমালোচক অকপটে বলতে পারেন যে, 'পেশাদার সাংবাদিকের মধ্যে দেশপ্রেম দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে তাই কাশ্মীরের মৌলবাদী আন্দোলন একান্ত যুক্তিযুক্ত সামাজিক বিপ্লব।' তাদের লেখায় কখনো উঠে আসে না যে, আফগানিস্তানের তালিবানদের কাছ থেকে কাশ্মীরের মুজাহিদিনদের মাধ্যমে অতিবামপন্থীরা ভারতে রেডিও কন্ট্রোল্ড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস এনেছিল। কারণ, মুজাহিদিন আর মাওবাদী সকলের লক্ষ্যই এক— ভারত তেরে টুকরো হোঙ্গে— ইন্সাল্লা, ইন্সাল্লা। কিন্তু কাজগগুলোর মালিক? যদিও অতিবাম ভাবনা কারো কারো 'স্টাইল স্টেটমেন্ট', কিন্তু মালিক তো নিখাদ বুর্জোয়া। তবে কি বাঙ্গালি মননের থেকে দেশপ্রেম মুছে দেওয়া এটাই আজকের কলকাতার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চাহিদা? বাঙ্গালিকে ভোলাতেই হবে যে দেশমাতৃকার ভাবনা অগ্নিযুগে বাংলার বিপ্লবীরাই ভারতবর্ষে ছড়িয়েছিলেন। বন্দে মাতরমের উৎপত্তি স্থল এই বাংলার মাটি, কলকাতার হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দই দেশকে স্বদেশ মন্ত্র দিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, সূর্য সেন ইংরেজের বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। এই দেশপ্রেমের ইতিহাস, এই ত্যাগের ইতিহাস, এই পরাভবের ইতিহাস বাঙ্গালিকে ভোলাতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিকে ভোলাতেই হবে যে কলকাতার মহানাগরিক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মহামানব! ▌

নবাঙ্কুর

পড়াশোনা সবার আগে

ক্লাস ফাইভের ছাত্র জয়ব্রত সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। ওর ডাকনাম জয়। ফর্সা মতো, ওলটানো চুল, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক খুঁজছি। ভগবানই মনে হয় আজ জুটিয়ে দিলেন। আপনার ছেলেকে রাস্তায় দেখতে পেলাম। তেমনি টানা চোখ, কোঁকড়ানো চুল। অবিকল

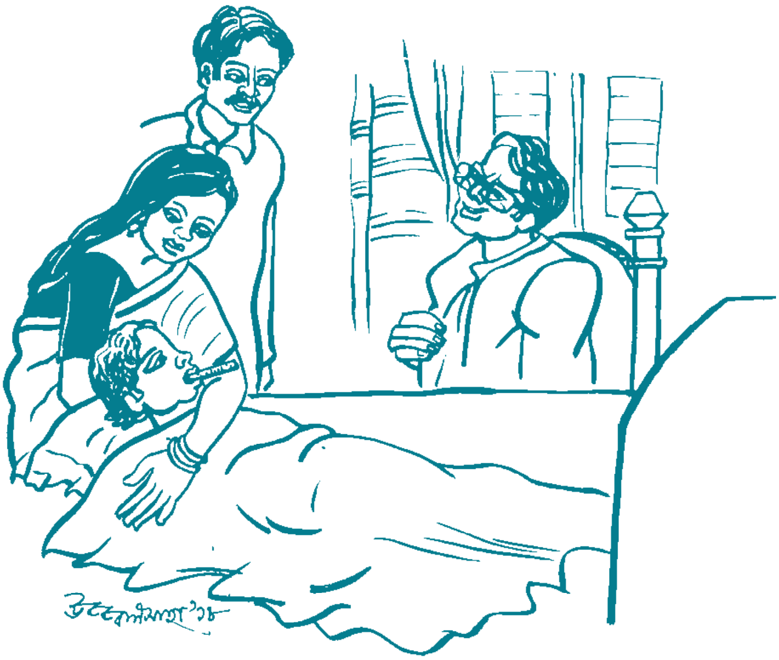

হঠাৎ তার সামনে এসে হাজির। বললেন, কিছু মনে করো না বাবা, আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চল। তোমার বাবার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। জয় তো অবাক। সে বলল, আসুন ,আসুন। ওই তো আমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

জয়ের বাবার কাছ গিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমি স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে একটা ছবি করছি। বিভিন্ন মহাপুরুষকে নিয়ে অনেক ছবিই আমি করেছি। তবু ভালো জিনিস তো পুরনো হয় না। আমি বিবেকানন্দের ছোটোবেলার জন্য একটি ছেলে বিলে— বালক বিবেকানন্দ। জয়ের বাবা বিস্মিত, হতবাক। ভদ্রলোক বললেন— আমিই পরিচালক। ওর পড়াশোনার কোনও ক্ষতি হবে না। ও ঠিক সময়েই বাড়ি ফিরবে। জয়ের বাবা সানন্দে সম্মতি দিলেন।

কিছুদিন পর থেকে শ্যুটিং শুরু হলো। পড়াশোনা লাটে উঠল জয়ের। মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলে গিয়ে পড়া মেক-আপ করে নিত। কিন্তু তাতেও তার পড়ার ক্ষতি হতে থাকল। সহপাঠীরা তার কাছে শ্যুটিংয়ের গল্প শুনতে চাইত। সে বলত ডিরেক্টর কাকু বলেন, লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন । ভুল হলে আবার করতে হতো।

এক সময় 'বিবেকানন্দ' অর্থাৎ জয়ের ছবি মুক্তি পেল। বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই ছবি দেখে অবাক। জয় যেন সত্যিই বালক বিবেকানন্দ— বিলে। নিজের ছবি নিজে দেখার আনন্দে জয়ও মেতে ওঠল।

এর পরই এল বিপর্যয়। জয় জ্বরে পড়ল। খুব জ্বর। জ্বরের ঘোরে সে প্রলাপ বকছে— 'আহ্ কাকু। আর কতবার এক কথাটাই বলব। বড্ড আলো, আমার চোখে লাগছে।' ডাক্তারবাবু বললেন, ' ওর উপর শারীরিক ও মানসিক অনেক ধকল গেছে। এখন ওর পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার।'

জয় ধীরে ধীরে ভালো হয়ে ওঠছে। একদিন তার স্কুলের শিক্ষক তথাগতবাবু ওকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন, জয়ব্রতকে আগে লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে। সিনেমা করাটা এখন মাথায় না ঢোকালেও চলবে। দু'একজন শিশুশিল্পীর নাম বললেন যারা পরবর্তীকালে সরে এসেছিল। ঠিক সময়ে সরে আসাটা একটা বড়ো কথা। জয় তার শিক্ষক তথাগতবাবুর হাতদুটো ধরে বলল— স্যার, এবার থেকে আমিও পড়াশোনা আর খেলাধুলা শুধু করব। তথাগতবাবু একটু হেসে বললেন, ইচ্ছে হলে একটু গানবাজনা আর আঁকাজোকাও করতে পারো।

—রূপশ্রী দত্ত

ভারতের পথে পথে

সোমনাথপুর

কর্ণাটক রাজ্যের কাবেরী নদীর তীরে প্রসন্ন চেন্নাকেশব মন্দিরের জন্য সোমনাথপুর বিখ্যাত। হোয়সল রাজত্বের সুবর্ণ যুগে দ্বারসমুদ্রের রাজা নরসিংহ তৃতীয়-র সেনাপতি সোমা নিজ নামে গ্রাম পত্তন করে তারা আকৃতির উঁচু টিলাতে ত্রিকুটচালা অর্থাৎ পাশাপাশি তিনটি মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের আয়তাকার চত্বরের মাঝে ভাস্কর্য মণ্ডিত ৬৪ টি কুলুঙ্গিতে নানা দেব-দেবীর বিগ্রহ সহ ডানদিকে জনার্দন ও বাঁদিকে বেণুগোপাল মূর্তি রয়েছে। মূল মূর্তির সন্ধান না পাওয়া যাওয়ায় চেন্নাকেশবের নতুন বিগ্রহ তৈরি করা হয়েছে। রয়েছে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ছ'ফুটের বিষ্ণুমূর্তি এবং বাঁশি হাতে গাছে ঠেস দেওয়া বেণুগোপাল মূর্তি। দক্ষিণ ভারতের এই সুন্দর মন্দিরটি আজও অক্ষত ও সযত্নে রক্ষিত।

জানো কি?

- আলোর প্রভাবে দেহের রং বদল করে গিরগিটি।
- আলোর প্রাভাবে চোখের রং বদল করে কুকুর ও বিড়াল।
- মানুষ লেখা পড়তে পারে আলোর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের জন্য।
- সবুজ কঁাচের মধ্যে দিয়ে দেখলে লালফুল কালো দেখায়।
- সাদা আলোর বর্ণালিতে মধ্য বর্ণ হলো হলুদ।
- শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ হলো ৩×১০^{৮} মিটার/সেকেন্ড।
- আলোর প্রভাবে মথ ডিম পাড়ে।

ভালো কথা

তুলসী মাহাত্ম্য

বাবার সঙ্গে চিঙ্গিশপুর যাচ্ছিলাম। গোপালপুর পেরিয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ির সামনে তুলসী বাগান দেখে আমরা দাঁড়ালাম। কী সুন্দর লাগছিল। বাবা বললেন এটা রমজান মিঞার বাড়ি। আমরা দাঁড়িয়ে থাকতেই রমজান মিঞা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কুয়ো থেকে তুলসীগাছে জল দিতে লাগলেন। বাবা বললো, চাচা মুসলমানের বাড়ির সামনে তুলসীগাছ কেন? রমজান মিঞা বললেন— বাবা, তুলসীর মাহাত্ম্য আমি জানি। এই তুলসীর পাতা রোজ খেয়ে আমি দশবছর ক্যানসার ঠেকিয়ে রেখেছি। আমি সবাইকে বলি তুলসীর গাছ লাগাও আর দৈনিক কটা করে পাতা খাও, তাহলে সব রোগ পালাবে। শুনে আমার খুব ভালো লেগেছিল।

তনিমা সরকার, একাদশ শ্রেণী, মানিকো, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল ম ঙ্গ দী

(২) জা ধি রা জ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) র হৃ য় বি ক দা দ

(২) ন্ত ব মা স গ ম স

২৬ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) চরণবন্দনা (২) জঙ্গলমহল

২৬ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) বিপরীতার্থক (২) বিমানসেবিকা

উত্তরদাতার নাম

(১) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান। (২) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (৩) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা। (৪) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ৩২

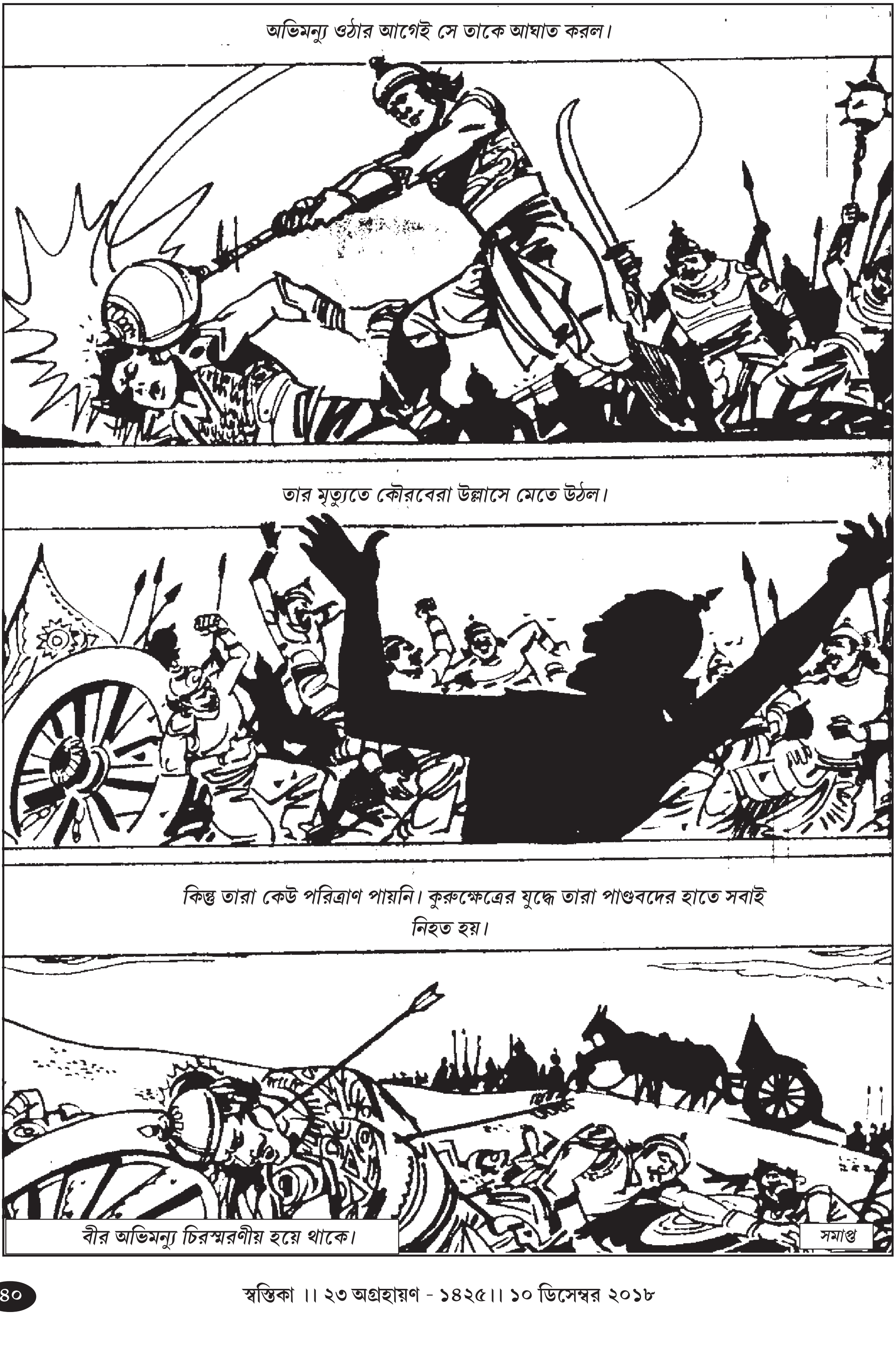

ভুবনেশ্বরে ভুবন কাপের আসর

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি কথা হচ্ছিল পূর্বাঞ্চলীয় সাই কেন্দ্রের অধিকর্তা মনমিত সিংহ গোয়েন্ডির সঙ্গে। কথায় কথায় জানালেন আসন্ন বিশ্বকাপ হকি (এই প্রতিবেদন অবশ্য প্রকাশ পারে টুর্নামেন্টের মধ্যেই) এক অন্যমাত্রা প্রদান করবে ওড়িশার রাজধানীকে। মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এত বড় আন্তর্জাতিক আসরকে পাখির চোখ করে তিন বছর আগে থেকে ঢালাও পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী সব কাজ বিশ্বকাপের অনেক আগেই শেষ করে ফেলেছেন। আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার সভাপতি নরেন্দ্র বাত্রা টুর্নামেন্ট শুরুর একমাস আগে সবকিছু খতিয়ে দেখে ওড়িশা সরকারকে লেটার মার্কস দিয়ে দিয়েছেন। সাই অধিকর্তা জানালেন নবীন পট্টনায়েক সব অর্থেই খেলা পাগল ও সমাজমনস্ক মানুষ। তাই এযাবৎ যে তিনবার ভারতে বিশ্বকাপ হকি অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে এবারের আসরটাই সবদিক থেকে সেরা হবে একথা অনস্বীকার্য।

এই প্রথম কোনও কর্পোরেট সংস্থা নয়, একটা রাজ্যের সরকার বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টকে স্পনসর করছে একই সঙ্গে ভারতীয় দলকেও পৃষ্ঠপোষকতা করে গোটা দেশের হকিপ্রেমীদের চোখ খুলে দিয়েছে। এজন্য কলিঙ্গ স্টেডিয়ামের খোলনলচে বদলে এতটাই ঝাঁ চকচকে, অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে যে বিদেশি রাষ্ট্রের কর্মকর্তা, খেলোয়াড় ও কোচেদের পর্যন্ত বলতে বাধ্য করেছেন যে এই স্টেডিয়ামে খেলার সুযোগ পাওয়া এক স্মৃতিমধুর অভিজ্ঞতা। মূল স্টেডিয়ামে আশেপাশে আরও কয়েকটি প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে যেখানে অনায়াসে বিশ্বপর্যায়ের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে পারে। গ্রান্ড হোটেলের পাশাপাশি আরও একটি পাঁচতারা হোটেল গড়া হয়েছে, যেখানে বিদেশি অতিথি দর্শকদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। একাধিক চারলেনের রাস্তা হয়েছে যা ভবিষ্যতে ভুবনেশ্বরের বাণিজ্যিক পরিকাঠামোকে সমৃদ্ধ করবে।

ভুবনেশ্বরকে বদলে দিতে ওড়িশা সরকার একশো কোটি টাকা খরচ করেছে। বাণিজ্যিক সংস্থা বা বিশ্বহকির নিয়ামক সংগঠনের কাছ থেকে কোনও সাহায্যই নেওয়া হয়নি। অংশগ্রহণকারী ১৬টি দেশের খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ছাড়াও সেসব দেশের শিল্প-কৃষ্টির সম্ভারে ভুবনেশ্বরের স্টেডিয়াম সংলগ্ন পার্কগুলি সেজে উঠেছে যা লক্ষ লক্ষ দেশি-বিদেশি হকিপ্রেমীর মন জয় করে ভুবনেশ্বরকে মহিমান্বিত করবে। অদূর ভবিষ্যতে এই রাজ্যে প্রচুর বিদেশি বিনয়োগ হবে। বিশ্বহকির বিভিন্ন গৌবরময় অধ্যায় দৃষ্টিনন্দন ম্যুরালের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই সব পার্কের দেওয়ালে। ভারতীয় হকি দল বহু বছর আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে শাসন করেছে। সেই স্বর্ণযুগের গৌরবগাথাকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের সাহার্য্যে মূর্ত করে তোলা হয়েছে স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের ভিতরে এক বিনোদন কেন্দ্রে।

এবারই প্রথম জগতবিখ্যাত সুরকার এ আর রহমানকে দিয়ে থিম সঙ্ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ম্যাচের শুরু এই থিম সঙ্ দিয়ে। জায়ান্ট স্ক্রিনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশের রেকর্ড তুলে ধরার ব্যবস্থাও অভিনব। বিশ্বকাপের ম্যাসকট 'ওলি' সারা শহরকে ছেয়ে ফেলেছে। শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ম্যাসকট এবং বিশ্বকাপের রেপ্লিকা বসানো হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে ভারত মোটামুটি না কঠিন না সহজ এমন এক গ্রুপে পড়েছে। বেলজিয়াম, দক্ষিণ কোরিয়া ও কানাডার চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে নক আউট স্টেজে যাওয়া খুব একটা কঠিন হবে না হরেন্দ্র সিংহের ছেলেদের। টুর্নামেন্টের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে বিশ্বের অন্যতম সেরা দল আর্জেন্টিনাকে ৫-০ গোলে চূর্ণ করে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামার সুযোগ পেয়ে গেছে ভারতীয়রা। এর আগে ভুবনেশ্বরে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও বিশ্বহকি লিগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত ব্রোঞ্জ জিতেছে। এবার কি সোনা জিতবে? বিশ্বকাপের আগে এশিয়ান গেমসে ব্যর্থ হয়েছে ভারত। চ্যাম্পিয়ন হবার বদলে তৃতীয় স্থান নিয়ে হতাশা, লজ্জা নিয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে। দেশের মাঠে এর আগের বিশ্বকাপে (২০১০ দিল্লি) চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে ভারত। তার আগে মুম্বই বিশ্বকাপে (১৯৮২) বিশ্বের এক নম্বর দল হিসেবে খেলতে নেমে পঞ্চমস্থান পেয়েছিল মহম্মদ সঈদ, জাফর ইকবাল, শেরউইন ফার্নান্ডেজ সোমাইয়া, সুরজিৎ সিংকে নিয়ে গড়া শক্তিশালী ভারত। পাকিস্তান সেবার জিতে ভারতের হকিসূর্য অস্তমিত করে দিয়েছিল।

পাকিস্তান বিশ্বকাপে সর্বাধিক সফল দেশ, চারবার জেতার সুবাদে। ভারত একবার চ্যাম্পিয়ন, একবার রানার্স।

■

মানবিক পুলিশের সহৃদয়তায় আপ্লুত অনুশিয়া

জন্মদিনে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে অনুশিয়া।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পুলিশ বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে উর্দি পরা একটা কঠিন চেহারা। আমরা যারা বাঙ্গালি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, তাদের কাছে পুলিশের আর একটা ছবি আছে। সে ছবি মেরুদণ্ডহীন দলদাসের। কিন্তু তার মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে পুলিশের মানবিক মুখ দেখতে পাই। সম্প্রতি ঠিক যেমনটা দেখলেন চেন্নাইয়ের মানুষও।

আট মাস আগেকার ঘটনা। চেন্নাইয়ের পাজাভানথানগাল থানার পুলিশকর্মীরা একদিন দেখলেন এক ভদ্রমহিলা থানার প্রবেশপথে বসে কাঁদছেন। ভদ্রমহিলাকে খুবই অসহায় লাগছিল। কাছাকাছি তার পরিবারের কেউ ছিলেন না। সেদিনের ঘটনার স্মৃতিচারণ করে ইন্সপেক্টর জি. বেঙ্কটেশন বলেন, 'আমরা তাকে থানার ভেতরে আসার কথা বললাম। আমাদের মনে হয়েছিল উনি বোধহয় থানায় ডায়েরি করতে এসেছেন। নিজেকে কিছুটা সামলে নেওয়ার পর উনি জানালেন, ওর নাম অনুশিয়া। স্বামী মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। নেশাখোর মাতাল ছেলে ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।' আশ্চর্যের ব্যাপার, একমাত্র পুত্রসন্তান মাকে তাড়িয়ে দিলেও তিনি কিন্তু ছেলের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি।

থানার অফিসাররা সিদ্ধান্ত নিলেন অনুশিয়াকে তারা সাহায্য করবেন। যেহেতু ছেলে কোনও টাকাপয়সা দেয় না, তাই ঠিক হলো অনুশিয়া থানাতেই কাজ করবেন। ইন্সপেক্টর বেঙ্গটেশন বলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম অনুশিয়াকে সকালবেলার জলখাবার এবং দু'বেলার লাঞ্চ ও ডিনার থানা থেকেই দেওয়া হবে। অনুশিয়া থানায় কাজ করতে রাজি হয়ে গেলেন এবং প্রতিদিন সকাল সাতটায় থানায় আসতে শুরু করলেন।'

সকালে এসেই অনুশিয়া ঝাড়পোঁছ করে ফেলেন। তারপর আলপনা দেন। এই পর্যন্ত পড়ে অনেকেরই চোখ কপালে উঠবে। থানায় আলপনা? হ্যাঁ, অনুশিয়া সেই অভাবনীয় কাজটাই করেন। সম্ভবত উর্দিপরা মানুষগুলোর কাছ থেকে যে সহানুভূতি তিনি পেয়েছেন, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারই কিছুটা ফেরত দেন পুলিশের আপাতকঠোর আঙিনা সাজিয়ে। আলপনা দেওয়ার পর তার কাজ জলের বোতল ভর্তি করা। ইন্সপেক্টর জি. বেঙ্কটেশন বলেন, 'এছাড়া আছে থানার সামনে মরশুমি ফুলগাছে জল দেওয়া কাজ। এরপর আমরা ওর জন্য জলখাবার আর কফির ব্যবস্থা করি। খাওয়ার পর অনুশিয়া বাড়ি ফিরে যান। বিকেলে আবার আসেন। থাকেন রাত পর্যন্ত। তারপর রাতের খাওয়া সেরে বাড়ি ফিরেন।'

এই আসা-যাওয়ার মধ্যে পুলিশের সহৃদয়তা ও সহানুভূতি আছে। আর যেটা আছে সেটা হলো, অনুশিয়ার একটা সম্মানজনক আশ্রয় পাওয়ার কাহিনি। কিন্তু কোনও বাঁক নেই। সেই অভাব পূরণ হলো গত ২৭ নভেম্বর। সেদিন অনুশিয়া থানায় গেলেন চকোলেট ভরা একটা প্যাকেট নিয়ে। ইন্সপেক্টর জি. বেঙ্কটেশন বলেন, 'স্কুলের বাচ্চারা যেরকম করে ঠিক সেইভাবে অনুশিয়া সবার হাতে একটা করে চকোলেট দিলেন।

আমি যখন জানতে চাইলাম, কীসের জন্য এই মিষ্টিমুখ? উনি বললেন, আজ আমার জন্মদিন। আমি তখনই এক কনস্টেবলকে জন্মদিনের কেক আনতে বললাম। অনুশিয়া আমাদের পরিবারের একজন সদস্য। আর তাছাড়া, আমরা ওকে অবাক করে দিতেও চেয়েছিলাম। যাই হোক, আমরা সবাই একটা ঘরে জড়ো হলাম। জন্মদিনের গান গাওয়া হলো। তারপর অনুশিয়া কেক কেটে সবাইকে এক টুকরো করে দিলেন।'

সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অনুশিয়া। কোনও কথা বলতে পারেননি। ৬৭তম জন্মদিনটি যে পুলিশের উদ্যোগে পালিত হবে, একথা তিনি বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অনুশিয়া বলেন, 'কেউ কখনও আমার জন্মদিন পালন করেনি। তাই থানার অফিসাররা যখন কেক কাটতে বললেন, খুবই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যেন আমার নতুন জন্ম হলো।'

এরকম ঘটনার কথা খুব বেশি আমরা জানতে পারি না। সমাজে পুলিশের ভূমিকা রক্ষকের। অপরাধীকে ধরাই পুলিশের কাজ। কিন্তু অনুশিয়া কোনও অপরাধ করেননি। তিনি শুধু সম্মানজনক একটা আশ্রয় চেয়েছেন। তাকে অনিশ্চয়তার আবর্তে ভেসে যেতে না দিয়ে পুলিশ এক্ষেত্রেও রক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। আর জন্মদিন পালনের ঘটনাটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে পুলিশের সংবেদনশীলতা। কঠিন উর্দির নীচে ঢাকা পড়লেও হৃদয় যে সবসময় মরে যায় না তার প্রমাণ দিয়েছেন পাজাভানথানগাল থানার পুলিশকর্মীরা। ■

নন্দন ও জঙ্গলখাস মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে

সনাতন রায়

চিত্রপট : ১

কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের পীঠস্থান নন্দন চত্বর। সেখানে সগর্বে হয়ে গেল ৩০ কোটি টাকার কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। গোটা চত্বর জুড়ে দেখা গেল চাঁদের হাট যে চাঁদেরা ২১ জুলাইয়ের 'শহীদ মঞ্চে'ও আলো ছড়ান। আর চতুষ্কোণ ছয়লাপ হয়ে রইল ব্যানার, হোর্ডিং আর কাট আউটে। বলাই বাহুল্য, সবগুলিতেই উজ্জ্বল উপস্থিতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হাস্যময়ী প্রতিচ্ছবি। গুনে গুনে ৫৪৭টি। সবাই দেখছিলেন। অনেকে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসছিলেন। কেউ বা ঠোঁট বেঁকিয়ে ঘাড় গুঁজে ঢুকে যাচ্ছিলেন হলের ভেতর। কিন্তু কিছু বলছিলেন না। বললেন একজনই। অনীক দত্ত যিনি 'ভুতের ভবিষ্যৎ' পরিচালনা করতে গিয়ে পালটে যাওয়া কলকাতার সংস্কৃতির গালে সপাটে থাপ্পড় মেরেছিলেন। এবারে থাপ্পড়টা সরাসরি। হলভর্তি দর্শকের সামনেই বললেন, ''সিনেমা এখন আর পরিচালক প্রযোজকদের বিষয় নয়, নন্দন প্রাঙ্গণে যাঁর ছবি ছড়িয়ে আছে, বাস্তবে তিনিই বোধহয় সিনেমার একমাত্র ব্যক্তিত্ব।''

চিত্রপট : ২

ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহলখ্যাত লালগড়ের জঙ্গলখাস গ্রাম। সেখানেই নভেম্বর মাসে ১১ দিনের মধ্যে লাশ হয়ে গেছে চার শবরের রক্ত- মাংসের শরীর। তার আগে আরও তিনজন মৃতদের পরিবার বলছে, 'পেট ভরে খাওয়া জুটত না। পয়সা রোজগারের জন্য রোজ কাজ জুটত না। অসুখে ওষুধ জুটত না।' এসব শুনে মুখ্যমন্ত্রীর বড় গোঁসা। রাখঢাক না করেই রায় দিয়ে দিয়েছেন, ''কেউ অনাহারে মারা যায়নি। রাজ্যের ৯ কোটি মানুষ ভরতুকিতে চাল গম পাচ্ছে। জঙ্গলমহলে দু' টাকা কিলো দরে মাথাপিছু ৮ কেজি চাল আর ৩ কেজি আটা পায় লোকজন। মানে পাঁচজনের পরিবার হলে ৫৫ কেজি চাল-আটা। অনাহারে মারা যায় না কেউই। তবুও কুৎসা চলছে। কেউ অসুস্থ হয়ে ওষুধ না খেলে, আমার কিছু করার নেই।''

গল্প এখানেই শেষ নয়।

আর ওদিকে জঙ্গলখাসে মুখ্যমন্ত্রীর রায় শুনেও ৩৫টি শবর পরিবার ফাঁস করে দিয়েছে, সরকার ২ টাকা কেজি দরে চাল দেয় ঠিকই, কিন্তু তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। যেমন মামনি শবরের ১১ জনের পরিবার।

নন্দন চত্বর মুখ ঢেকেছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে।

নন্দনে সেদিন ওই ভয়ঙ্কর কথা বলার পর অনীক দত্তর মোবাইলে অবিরাম হুমকি আসতে থাকে তাঁকে ভাতে মারার। অনীক অবশ্য তাতে ঘাবড়ে যাননি। স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, 'ভাতে মারলে রুটি খাব। আসলে আমার মনে হয়, একটা বড় অংশের মানুষ কেমন দমবন্ধ অবস্থায় রয়েছেন। তাঁরা নিজেদের ভাবনা বা কথাগুলোকে ঠিক মতো করে উপস্থাপন করতে পারছেন না। হয়তো ভয় পাচ্ছেন। একটাই জীবন তো। দমবন্ধ অবস্থায় বাঁচতে পারি না। কলকাতা শহরটার আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এ যেন কোনও অচেনা শহর।

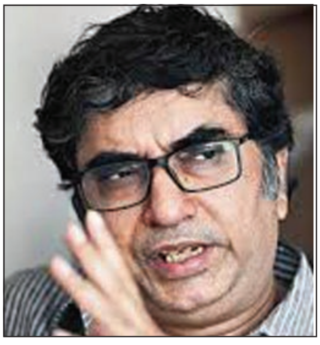

পরিচালক অনীক দত্ত

রেশনের চাল মেলে ১১ কেজি সপ্তাহে। বিডিও সাহেব যদিও দাবি করেছেন, রেশন ছাড়াও ত্রাণের চাল দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা বলেছেন, পান না। এমনকী ১০০ দিনের কাজও না। গ্রামে প্রচুর টিউবওয়েল। কিন্তু খেতে হয় কুয়োর জল। কারণ কোনও টিউবওয়েলেই জল পড়ে না। আর সব চাইতে বড় খবর—ইন্দিরা আবাস যোজনায় কিছু পরিবার ৭৫ হাজার টাকা পেয়েছে। কিন্তু প্রথম দফায় ১৮ হাজার টাকা দেওয়ার সময় পরিবার পিছু ৩ হাজার টাকা দিতে হয়েছে তৃণমূল দলের নেতাদের হাতে। সেই মুখ্যমন্ত্রীর ৭৫ শতাংশ-২৫ শতাংশ-এর হিসেব একদম পাকা।

আজকের পশ্চিমবঙ্গের হালচাল বোঝার জন্য এই দুটি চিত্রপটই যথেষ্ট। উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ যে আদতে গোয়েবলসিয় প্রচার তা পরিষ্কার হয়ে গেছে ফোলানো বেলুনে দুটো পিনের ছোঁয়া লাগতেই। পশ্চিমবঙ্গে ঠিক কী চলছে তা জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজন নেই। মাথা ঘামাতে হয় না এটা জানার জন্য যে ২০১০

সালে যে চলচ্চিত্র উৎসবে খরচ হয়েছিল এক কোটি টাকারও কম, ২০১৮-য় সেই উৎসবেই কেন খরচ হয় ৩০ কোটি। হিসেব করার দরকার পড়ে না, কেন মুখ্যমন্ত্রী গলা উঁচিয়ে বলেন, ''উৎসব করি বলে কেউ কেউ নানা কথা বলে। উৎসব মানে তো আনন্দ। মানুষ হাসবে না? উৎসব করব না তো কি শ্রাদ্ধ করব?'' আর কেনই বা লালগড়ে শবরদের এই চরম দুঃখের দিনেও কোনও মন্ত্রী-সান্ত্রী ছুটে যান না, যাঁরা একদা জন-আন্দোলনের ঢেউ তুলতে আজকের জেলবন্দি মাওবাদী নেতা ছত্রধর মাহাতোর মোপেডে পিনিয়ন রাইডার হয়ে চষে বেড়াতেন গোটা জঙ্গলমহল।

মুখ্যমন্ত্রী অনেক বই লেখেন। ৪০ পাতা ৫০ পাতার বই। মুখ্যমন্ত্রী অনেক ছড়া লেখেন। গান লেখেন। গানে সুর দেন। নিজে গান গেয়েও থাকেন। আবার দু-চার জন সাংবাদিক, মন্ত্রী ও তাঁবেদারকে পাশে বসিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত গান শেখানও।

কিন্তু বোধহয় এটা জানেন না, আধুনিক সংবাদ অনুসারে উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি নয়। মোট জাতীয় উৎপাদনের বদলে জীবনের উৎকর্ষ সাধনই উন্নয়নের মূল কথা। জড় এবং চেতন উভয় জীবনের উন্নতিই উন্নয়নের লক্ষ্য। অর্থনৈতিক চাহিদা যেমন মেটাতে হবে, তেমনই সূক্ষ্ম মূল্যবোধও গড়ে তুলতে হবে। ফলে আজকের দিনে উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি নয়, আরও বহু কিছু— যেমন উন্নত ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য, বেকারদের চাকরি ও আয়ের সমবণ্টন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের যথাযথ ব্যবস্থা, প্রয়োজন অনুসারে একটি বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে কোনও সমাজকে পরিবর্তিত করা। যাতে মানুষ উন্নতর মানবিক মূল্যবোধ উপলব্ধি করতে পারে। আজকের দিনে উন্নয়ন মানে পরিবেশ, রাজনীতি ও পরিস্থিতির ওপর সামাজিক মানুষের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ঢালাও টাকা দেওয়া নয়। উন্নয়নের নতুন অর্থ হলো প্রতিটি সমাজের পরিস্থিতি ও জনসাধারণের ঘোষিত অভিপ্রায় অনুসারে উন্নয়ন। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা তাই জোর দেন গ্রামীণ উন্নয়নে, ব্যক্তিগত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে, উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে, প্রতিটি গ্রামের আত্মনির্ভরশীল স্বতন্ত্র উন্নয়নে এবং উন্নয়নের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধনে।

মুখ্যমন্ত্রী এসব তত্ত্বে আদৌ আগ্রহী নন। যদি হতেন, তাহলে তাঁর হিসাব মতো 'বিপুল উন্নয়ন'-এর দায় মাথায় নিয়ে আজ লালগড়ে ৭ শবর সন্তানকে মৃত্যুর হাতছানিতে সাড়া দিতে হতো না। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর জেলাশাসক ও বিডিওদের মিথ্যা বাণী শোনাতে হতো না। পাঠাতে হতো না খিচুড়ি, পানীয় জল, জামাকাপড়। মুখ লুকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা তার শাগরেদদের কলকাতায় বসে থাকতে হতো না। বুক ফুলিয়ে ছুঁতে পারতেন লালগড়ের মাটি।

পারছেন না। কারণ মুখ্যমন্ত্রী জানেন, ওই শবররা যে মদ খেয়ে প্রতিদিন মাতাল হচ্ছে, তিনি নিজেই গ্রামে গ্রামে সেই মদ তৈরির লাইসেন্স দিচ্ছেন ঢালাও হারে। পারছেন না, কারণ তিনি জানেন, জঙ্গলখাসের কন্যারা 'কন্যাশ্রী' নয়। তাঁরা স্কুলে যায় না। তারা মিড ডে মিলের ডিম ভাত পায় না। তাদের পেটের ভাত জোগাড় করতে হয় গায়ে-গতরে খেটে। পারছেন না, কারণ মুখ্যমন্ত্রী বোঝেন, উন্নয়নের ঢাকটা আসলে নির্বাচনী বৈতরণী পারের সাঁকো। যাঁরা সহজে এসব মেনে নেবেন, তাঁরা ভালো থাকবেন। না মানলে বীরভূমের কেষ্টাকে দিয়ে চড়াম চড়াম করে ঢাক বাজাবেন বা বাতাস-জল খাওয়াবার ব্যবস্থা করবেন।

আধুনিক জ্ঞাপন বিদ্যায় বলা হচ্ছে, জ্ঞাপন ও উন্নয়ন হলো পরস্পরের দোসর। উন্নয়ন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং তা নির্ভরশীল জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ওপর। স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে জ্ঞাপন বা কমিউনিকেশনের প্রশ্ন যা সম্ভব করে তোলে গণমাধ্যম। কারণ গণমাধ্যম হলো ম্যাজিক মাল্টিপ্লায়ার যা একটি বার্তাকে নিমেষে লক্ষ লক্ষ গণশ্রোতার কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

সমস্যাটা এখানেই। মুখ্যমন্ত্রী যদি চাইতেন উন্নয়ন এবং জ্ঞাপন প্রকৃত অর্থে দোসর হয়ে উঠুক তাহলে উনি গণমাধ্যমের মুখ বন্ধ করতে উদ্যোগী হতেন না। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিথ্যা ভাষণে ভরাতে হত না রাজ্যের দিকবিদিক। বিজ্ঞাপনী ভিক্ষা দান করে জুজুর ভয় দেখিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলিকে চোখে ঠুলি পরিয়ে বসে রাখা হতো না। এমনকী, সরকারি আমলা যাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রকৃত উন্নয়নকামী মানুষদের সচেতন করা, পরিবর্তন-প্রতিভূ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা, তাঁরা বুঝে গেছেন, এ রাজ্যে মাইনে পেতে গেলে কাজ করতে হয় না। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করলেই কেল্লা ফতে।

আসলে উনি জানেন, যা করেছেন তা আসলে কসমেটিক্স ডেভেলপমেন্ট। কালো মেয়ের মুখে পাউডার মাখিয়ে যাত্রামঞ্চে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। নীল-সাদা রঙের চিকনের আড়ালে আবডালে অনুন্নয়নই উঁকি মারছে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের অভ্যাস মতোই। আসলে সবই সিঙ্গুরের মাটির মতো যেখানে তৈরি কারখানা ভাঙা পড়েছে। চাষও হয় না। অথবা জঙ্গলমহলের মতো যেখানে অনুন্নয়নের চোরাস্রোতে আজ ফের অনুপ্রবেশ ঘটছে কিষেণজীদের, আকাশদের যারা আকাশমণির জঙ্গের আড়ালে আবডালে বসে কষছে সেই পুরনো ছক। গরিবের রাজ্য শাসন।

জঙ্গলখাসে মাওবাদী।

কলকাতা শহরে নকশাল।

এরা কেউই আর মুখ্যমন্ত্রীর আঁচলে বাঁধা নেই।

তাই জঙ্গলখাস ফের গর্জে উঠছে। বলছে— পেট ভরার ভাত তো পাই না বাবু। তাই অনীক দত্তরা হাসছেন কিন্তু বলছেন, ভাতে মারবেন? মারুন। রুটি খাব। তাই হাওড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলরের তৈরি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ভেসে উঠতেই প্রতিবাদের বাঁধ গড়ে ওঠে।

তাই কোনও কবি আজ মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন না— তোর কাপড় কোথায়? কারণ কবিও জানেন, মুখ্যমন্ত্রী গোটা রাজ্যটাকেই নগ্ন করে দিয়েছেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বার্থে। এবার বোধহয় শেষের প্রহর গোনার সময় এসে গেছে। ■

বিশেষ নিবন্ধ

বৈবাহিক সম্পর্ক ও পরকীয়া একসঙ্গে চলতে পারে না

নরেন্দ্রনাথ মাহাতো

সুপ্রিম কোর্টের পরকীয়া সংক্রান্ত সাম্প্রতিক রায় নিয়ে সর্বত্রই বাদানুবাদ চলছে। পরকীয়ার সমর্থকেরা, যাঁরা এতদিন মুখ বন্ধ করেছিলেন তাঁরা এখন গৌরবান্বিত হয়ে পরকীয়ার মাহাত্ম্য কীর্তনে ময়দানে নেমে পড়েছেন! বহুত্ববাদের এই দেশে বর্তমানে পরকীয়াবাদ সর্বাধিক আলোচ্য বিষয় বলা চলে!

পরকীয়াবাদীদের বক্তব্য হলো, (১) পরকীয়ায় বিস্তৃত হয় সম্পর্কের সীমারেখা। (২) পরকীয়ার পিছনে বড় কারণে বৈবাহিক জীবনের অতৃপ্তি, সুখের টানাপোড়েন যৌন জীবনের অপূর্ণতা। বিবাহিত জীবনের একঘেয়েমি এবং বৈচিত্র্যের তৃষ্ণাকাতরতা। (৩) পরকীয়া হলো প্রেম। মনও সেখানে লিপ্ত। পরকীয়া নিছকই শরীরের খেলা নয়। হৃদয়ের উৎস সন্ধান করা যায় এ সম্পর্কে ইত্যাদি।

পরকীয়া যদি সম্পর্কের সীমারেখাকে বিস্তৃত করে, তবে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? অতি প্রাচীনকালে বিশৃঙ্খলা আরণ্য যুগের বলগাহীন ও দায়িত্ব-বর্জিত যৌন জীবনের বিশৃঙ্খলাজনিত বহুবিধ অনিশ্চয়তা থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে রক্ষা করার জন্যই বিবাহের বিধি প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরকীয়ার কারণে সেই বৈবাহিক সম্পর্ক ধ্বংস হতে বাধ্য। তাই বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পরকীয়া দুটোই এক সঙ্গে চলতে পারে না।

পরকীয়ার মাধ্যমে এইসব সমস্যার সমাধান হবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়?

বিবাহিত জীবনে সুখী বা অসুখী হওয়ার পিছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। কোনও প্রকার আইন প্রণয়ন করে এগুলির সমাধান হতে পারে না। বিবাহিত দম্পতির উভয়ের মধ্যে দৈহিক যোগ্যতা, মানসিক রুচিবোধ, চারিত্রিক সৌন্দর্যজ্ঞান, ব্যবহারের শোভনতা, পরস্পরের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে অনুভবশীলতা এবং কী করে একে অপরের সুখ-সম্পাদনে সর্বদা পরিপূরক হতে পারে, সে বিষয়ে মননশীলতা প্রভৃতির দিক দিয়ে একটা সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য এবং সমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এতগুলি বিষয়ে খোজখবর নিয়ে বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়। তাই বিবাহিত জীবনে কমবেশি সমস্যা থাকবেই। আবার যৌবন ক্ষণস্থায়ী, দেহ ক্ষণভঙ্গুর, মন পরিবর্তনশীল এবং সুখলাভ চেষ্টা সহস্র সহস্র স্থলেই ব্যর্থতাপূর্ণ। সুতরাং নারী ও পুরুষের দাম্পত্যজীবন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান পরকীয়ার মাধ্যমে হবে, এ ধারণা ভ্রান্ত। এই কারণেই গার্হস্থ্য জীবন তথা দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হলে দাম্পত্য-সংযমকে অত্যাবশ্যক অঙ্গ বা অপরিহার্য শর্ত বলে মানতে হবে। নচেৎ ক্যান্সারগ্রস্ত স্ত্রীকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখে স্বামী পরকীয়ায় মত্ত হবে। পরকীয়ায় মত্তপুরুষ কখনও স্বাভাবিক আয়ে সংসার চালাতে পারে না। সুতরাং পরকীয়ায় যে সুখ তাতে শান্তি নেই। সংযমেই দাম্পত্য জীবনের সুন্দরতা, সুশ্রীতা, শোভনতা। সংযমেই শান্তি, তৃপ্তি ও প্রগাঢ় একাত্মতাবোধ সুসম্ভব।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, যে পরকীয়া আদালতের আলোচ্য বিষয়, তা 'বৈষ্ণবীয় পরকীয়া' (দেহাতীত প্রেম) নয়। আদালতের আলোচ্য বিষয় হলো 'চার্বাকীয় পরকীয়া'। ব্যক্তিগত ভোগতৃষ্ণা, ব্যক্তিগত ভোগলুব্ধতা, ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা থেকেই এই পরকীয়ার উৎপত্তি। অর্থাৎ দেহজ কামই এই পরকীয়ার উৎস। এই পরকীয়া কখনওই প্রেম নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত স্বামীর জন্য মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অপেক্ষা করে থাকেন স্ত্রী যার শক্তিতে, তারই নাম প্রেম।

স্মরণে রাখা দরকার, পরকীয়া মানুষকে পশুর শ্রেণীতে অবনমিত করে। কাজেই এর মধ্য দিয়ে জগতে নারী-পুরুষ সংক্রান্ত সাম্য-প্রতিষ্ঠা করার যুক্তি কুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি। সার্বিকভাবে জগতে সাম্য-প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে চাই, মানব-মনের ক্লেদরাশি ও পাপবুদ্ধির দৌরাত্ম্য বিদূরিত করা। অর্থাৎ প্রত্যেককে হতে হবে ভ্রমবর্জিত, অপাপবিদ্ধ ও অসত্যমুক্ত। বুঝতে হবে— আত্মসুখের লালসাই মানুষকে পরাধীন করে, অমানুষ করে। বুঝতে হবে আত্মসুখের লালসাই চির-দুঃখের ধাত্রী। বলাই বাহুল্য, আত্মসুখের লালসারই আর এক নাম পরকীয়া। ▮

বিরাট হিন্দু সম্মেলন

১৫ই ডিসেম্বর-২০১৮, শনিবার

বেলা ১২টা

শহীদ মিনার ময়দান, কলকাতা

আহ্বায়ক

হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ

মোদীকে মেহবুবা মুফতির অনুরোধ
সারদা পীঠে তীর্থযাত্রীদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কিছুদিন আগেই ভারত পাকিস্তান দুই দেশের সম্মতিতে করতারপুর করিডোরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে খুশি সারা বিশ্বের শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ। এই ঘটনায় আপ্লুত হয়ে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বহুদিনের স্বপ্নপূরণে এগিয়ে এসেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট মেহবুবা মুফতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এক চিঠিতে তিনি পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত প্রাচীন বিদ্যাশিক্ষাকেন্দ্র এবং পীঠস্থান সারদাপীঠে যাওয়ার জন্য অনুরূপ করিডোর নির্মাণের অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা প্রতিবছর সারদা পীঠে তীর্থযাত্রা করতেন। ন'য়ের দশক থেকে যা বন্ধ হয়ে যায়। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা যাতে আবার তীর্থে যেতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মেহবুবা নরেন্দ্র মোদীকে অনুরোধ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফ্‌ফরাবাদ থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে নিলম নদীর উপত্যকায় গেলে এখনও দেখতে পাওয়া যায় সারদা পীঠ এবং সারদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ। যার নামে পীঠের নামকরণ সেই দেবী সরস্বতীর মূর্তিটিও রয়েছে। নিলম (কিষণগঙ্গা) নদী অদূরে মধুমতী নদীর সঙ্গে মিশেছে। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাছে সারদা পীঠের গুরুত্ব অপরিসীম। তীর্থযাত্রার অধিকার ফিরে পাবার জন্য তাঁরা অনেকদিন ধরে দাবি জানাচ্ছেন।

মেহবুবা মুফতির প্রচেষ্টা আন্দোলনকে শক্তি জোগাবে বলে মনে করছেন অনেকে। এক টুইটবার্তায় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারদা পীঠ এবং কাটসরাজের মতো তীর্থস্থানে তীর্থযাত্রা আবার শুরু করতে পারলে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের উন্নতি হবে।

হায়দরাবাদ থেকে ভাগ্যনগর
বিজেপি নাম বদলাতে প্রস্তুত : যোগী আদিত্যনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি হায়দরাবাদে আয়োজিত এক জনসভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বিজেপি শুধু হায়দরাবাদের নাম বদল করে ভাগ্যনগর রাখার কথা ভাবছে না, এ শহরের যেসব গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের জঙ্গিযোগ রয়েছে তাদের ধ্বংস করার কথাও ভাবছে। একমাত্র বিজেপি সরকারই এই শহরকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারে। বহুচর্চিত আসাদুদ্দিন ওয়েসির কার্যালয় থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে বেগমবাজারে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি বলেন, 'বিজেপি দেশে রামমন্দির নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করেছে। তেলেঙ্গানার উচিত 'এই সংকল্প রূপায়ণে যথাযথ ভূমিকা পালন করা।' এরপরই তিনি বলেন, 'আপনারা যদি হায়দরাবাদকে ভাগ্যনগরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে বিজেপিকে ভোট দিন।' বিরোধী রাজনীতির মুখোশ খুলে দিয়ে তিনি বলেন, 'প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী হামলার সঙ্গে কিছু-না-কিছু যোগাযোগ হায়দরাবাদের আছে। আমাদের দেশীয় রাজনীতিতে যদি মুসলমান তোষণ না থাকত তাহলে সন্ত্রাসও থাকত না। কংগ্রেস জঙ্গিদের বিরিয়ানি খাওয়ায় আর বিজেপি সরকার নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দেয় সুযোগ পেলেই জঙ্গিদের মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে।' গত ১৭ নভেম্বর দিনটি ভারতে হায়দরাবাদের সংযুক্তিকরণ দিবস হিসেবে পালন না করার জন্য তিনি তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির নেতা চন্দ্রশেখর রাওয়েরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'ভারতীয় হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই গর্ববোধ করা উচিত। কিন্তু কংগ্রেস এবং টি আর এস (তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি) ভোটব্যাঙ্কে ধস নামার ভয়ে ১৭ নভেম্বর দিনটি পালন করেনি। আমরা ক্ষমতায় এলে প্রতিবছর দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুরনো হায়দরাবাদ অঞ্চলটি মুসলমান প্রধান। আসাদুদ্দিন ওয়েসি এখানকার নেতা। তার নাকের ডগায় যোগী আদিত্যনাথকে ঘিরে এই উদ্দীপনা তেলেঙ্গানায় বিজেপির পায়ের নীচের মাটি ক্রমশ মজবুত হওয়ার লক্ষণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

২০২২-এ জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০২২ সালে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ভারতে। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এয়রসে ত্রয়োদশ জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ৭৫তম বর্ষও উদ্‌যাপিত হবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বর্ষপূর্তিকে বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রগতি এবং উন্নয়নের বেশ কিছু নজিরও তুলে ধরতে চাইছে সরকার। ২০২১-২২ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্যও এখন থেকেই চেষ্টা শুরু করেছে ভারত। এ বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে সঙ্গেও কথা শুরু হয়েছে।

২০২২ সালেই যাতে ভারতের মাটিতে বুলেট ট্রেন চালু করা যায়, তার জন্যও জাপানকে চাপ দিচ্ছে ভারত সরকার। ওই বছরই ভারত মহাকাশে ভারতীয় নভশ্চর পাঠাবে বলেও চিন্তাভাবনা করছে। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) জানিয়েছে, ২০২২ সালে তিনজন নভশ্চরকে তারা সাতদিনের জন্য মহাকাশে পাঠাবে।

২০২২ সালে ভারতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ইতালিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২২ সালে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করার কথা ছিল ইতালির। কিন্তু ইতালি সে সুযোগ ভারতকে দিয়েছে। ২০২৩-এ এই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করবে জাপান এবং ২০১৪-এ সৌদি আরব। নরেন্দ্র মোদী এক ট্যুইট বার্তায় বলেছেন— '২০২২ সাল ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর। এই বিশেষ বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই ওই বছর জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করছে ভারত। সবাইকে আমন্ত্রণ করছি বিশ্বের দ্রুততম আর্থিক বিকাশের দেশ ভারতকে প্রত্যক্ষ করুন। ভারতের ঐতিহ্যময় ইতিহাস এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে জানুন। উপভোগ করুন ভারতীয় অতিথেয়তা।

ভারত সরকারের এক মুখপাত্র বলেছেন, ২০২২ সালকে সামনে রেখে কেন্দ্র সরকার বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের উপস্থিতিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতেই এই কর্মসুচিগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতেই এরকম বেশ কিছু কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হবে।

অর্থ তছরুপ মামলায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর জন্য জি-২০ সম্মেলনে ভারতের ৯টি পরামর্শ

- ঋণ খেলাপিদের মোকাবিলায় জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব।
- আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি। ঋণ খেলাপিদের দ্রুত প্রত্যার্পণের বিষয়ে গুরুত্ব।
- সব ঋণ খেলাপিদের প্রবেশ বন্ধ করতে ও অন্য দেশকে তাদের নিরাপদ স্থান হিসাবে চিহ্নিত না করতে জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির একটি কার্যকর প্রক্রিয়া গঠনে গুরুত্ব।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি, সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতিগুলির মূল চিন্তাভাবনাকে, বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়টি কার্যকর করা।
- ঋণ খেলাপিদের সম্পর্কে যথাসময়ে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়টিতে প্রাধান্য দেওয়ার পরামর্শ।
- ঋণ খেলাপি অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র তৈরি করা।
- ঋণ খেলাপি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনিভাবে লড়াইয়ের জন্য একটি সর্বসম্মত নীতি-প্রক্রিয়া গঠন এবং প্রতিটি জি-২০ দেশের নিজস্ব আইন অনুসারে একটি সঙ্ঘবদ্ধ নীতি-নির্দেশিকা তৈরি।
- দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া-সহ নীতি খেলাপের বিভিন্ন ঘটনার বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করলে সেগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য একটি সাধারণ মঞ্চ গঠন।
- যেসব ঋণ খেলাপিদের দেশে কর বাকি রয়েছে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা বাড়ি বাজেয়াপ্তর জন্য জি-২০ মঞ্চের উদ্যোগে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব আরোপ।

নীরব মোদীর দুর্নীতির তথ্য আয়কর বিভাগ আগেই জেনেছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভুয়ো লেনদেন, ভুয়ো কেনাবেচা এবং ভুয়ো মজুতের হিসাব দেখিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত পি এন বি থেকে ১৩ হাজার কোটির বেশি টাকা ঠকিয়ে নেওয়া নীরব মোদী এবং মেহুল চোকসির আর্থিক তছরুপ সম্পর্কে আয়কর বিভাগ অনেক আগেই তথ্য সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু রহস্যজনক কারণে আয়কর বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা এই সংক্রান্ত তথ্য অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেননি। বিপুল পরিমাণ অর্থ তছরুপ করে নীরব মোদী এবং মেহুল চোকসি এই বছর জানুয়ারি মাসে দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যান। তার অন্তত সাত মাস আগে আয়কর বিভাগ একটি তদন্ত করে আর্থিক কেলেঙ্কারির কথা জানতে পারে। ২০১৭ সালের ৮ জুন ১০ হাজার পাতার একটি তদন্ত রিপোর্টও প্রস্তুত করে আয়কর দপ্তর। কিন্তু ওইটুকুই সার। এরপর এই বিষয়টি অন্য তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে জানানোর প্রয়োজনই বোধ করেনি আয়কর দপ্তর।

আয়কর দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালের জুন মাসে এই তদন্ত রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেলেও, সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এস এফ আই ও), সিবিআই, ইডি এবং ডাইরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স (ডি আর আই)-কে এ বিষয়ে আয়কর বিভাগের তরফ থেকে বিন্দুবিসর্গ জানানো হয়নি। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্জাব ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পরই আয়কর বিভাগ তদন্তকারী সংস্থাকে সবকিছু জানায়। আয়কর দপ্তরের সূত্র আরও জানাচ্ছে, তদন্ত করে তারা কী পেয়েছে আয়কর দপ্তর সে তথ্য রিজিওনাল ইকনমিক ইনটেলিজেন্স কাউন্সিল (আর ই আই সি)-কেও তারা জানায়নি। অথচ এই আর আই সি বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভিতর তথ্য আদানপ্রদানের কাজটি করে থাকে।

নীরব মোদী, মেহুল চোকসি এবং তাদের অংশীদারিত্বের তিনটি সংস্থা ডায়মন্ড আর ইউ এস, সোলার এক্সপোর্টস এবং স্টেলার ডায়মন্ডস রাষ্ট্রায়ত্ত পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে ১৩,৫০০ কোটি টাকা তছরুপ করেছে। ২০১৭-এর জানুয়ারি মাসে নীরব মোদীর অফিসে তল্লাশি চালায় এবং তার আত্মীয় মেহুল চোকসির মালিকানাধীন কোম্পানিগুলি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে। সারা দেশে মোট ৪৫টি জায়গায় আয়কর বিভাগ তল্লাশি চালায়। আয়কর দপ্তরের এক আধিকারিক বলেছেন, আয়কর দপ্তর অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে এসব তথ্য প্রমাণ এই কারণেই বিনিময় করেনি যে, তথ্য বিনিময়ের এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এবছর জুলাই আগস্ট মাস থেকে এইসব তথ্য অন্য তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে দেওয়া হচ্ছে বলে ওই অধিকারিক জানিয়েছেন। আয়কর দপ্তরের তদন্তে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছিল— সুরাটে নীরব মোদীর সংস্থায় মজুত পণ্যের মূল্যমান অতিরিক্ত ভাবে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল, মোদীর সংস্থা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সুদ ছাড়াই বিভিন্ন ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

মুম্বইয়ের তিনটি সংস্থার কাছ থেকে ৩৪৪ কোটি এবং ২০২১ কোটি টাকা ভুয়ো খরিদের হিসাব দেখানো হয়েছিল, কোম্পানির অভ্যন্তরে ৫১৫ কোটি টাকা লেনদেনের কোনও হিসাব দেখানো হয়নি, মোদীর মালিকাধীন গীতাঞ্জলি জেমস পরিবারভুক্ত লোকজনদের নামে ভুয়ো আর্থিক অনুদানের হিসাব দিয়েছিল প্রভৃতি।

রাশিয়া-ভারত-চীন ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিংপিং-এর মধ্যে বুয়েনস এয়ারসে আজ ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়।

তিন নেতাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর এবং তিন দেশের মধ্যে মতামত বিনিময়ের বিষয়ে গুরুত্ব দেন তাঁরা। বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং মুক্ত বিশ্ব অর্থনীতি আন্তর্জাতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে বলে তিন নেতাই মত পোষণ করেন।

আলোচনায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শান্তি ও সুস্থিতির জন্য নিয়মিত আলোচনার প্রয়োজন বলে রাশিয়া-ভারত-চীন মতামত দিয়েছে। ব্রিক্স, এসসিও এবং ইএএস-এর সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও সন্ত্রাসবাদের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়েছেন তাঁরা।

রাশিয়া-ভারত-চীন বা আর আই সি-র মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়টিতে তিন নেতাই গুরুত্ব দেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আরও প্রয়োজন বলেও তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন।

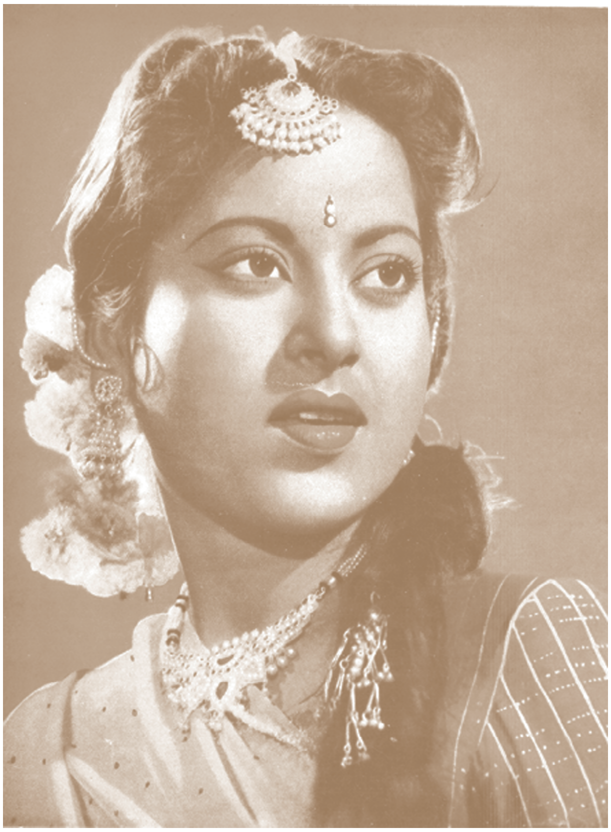

অনিতা গুহ

সন্তোষী মা ছবিতে অভিনয় তাঁকে পরিচিতি দেয়

দিলীপ পাল

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে তিনি পৌরাণিক ছবি 'দেবী'র চরিত্রে অভিনয় করে নিজের এক আলাদা পরিচিতি পেয়েছিলেন। সেই সময়ের অভিনেত্রী মীনাকুমারী, গীতা বালী'র মতো প্রথম শ্রেণীর নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর নাম এক সঙ্গে উচ্চারিত হতো, তিনি হলেন অনিতা গুহ। অনিতার পিতা ছিলেন ফরেস্ট অফিসার। তিনি মিস্ কলকাতার মুকুট পরার পর মুম্বইতে চলে যান। ১৯৫২ সালে মুম্বইতে বরোদা স্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষ আর হলিউডের লী ক্যামারুন মিলে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। যেখানে অংশগ্রহণ করেন অনিতা গুহ এবং জয়লাভও করেন। বরোদার স্টুডিয়োর সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয় ৬ বছরের জন্য। প্রতি মাসে তিনি পাবেন ৩০০ টাকা করে। তাঁর সঙ্গে অনিতাকে হিন্দিও শিখতে হবে। কেননা তিনি হিন্দি বলতে পারতেন না। অনিতা চুক্তির শর্ত মানতে রাজি ছিলেন। এবং মধ্যে হঠাৎ অনিতার বাবার শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। যার জন্য তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। এরই মাঝে তার বাবার মৃত্যু হয়। মা আর তাকে মুম্বইতে যেতে দিতে রাজি হননি। ফলে মুম্বইতে হিন্দি ছবির কাজের স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। যাঁর জন্য বরোদার স্টুডিয়োর সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়। টলিউডের ছবির প্রযোজক-পরিচালকেরা যখন জানতে পারেন মুম্বইয়ের 'ট্যালেন্ট শো' প্রতিযোগিতায় তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তখন খুব সহজে তিনি বাংলা ছবিতে সুযোগ পেয়ে যান। তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি হলো 'বাঁশেরকেল্লা। এদিকে হয়েছে কী, হিন্দি ছবির প্রখ্যাত অভিনেতা ওমপ্রকাশ নিজের একটি ছবি রিলিজ উপলক্ষ্যে কলকাতায় এসেছিলেন। ওই ছবির প্রিমিয়ারে অনিতা গুহ'র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। ওখানে, 'ইয়ে দুনিয়া গোল হ্যায়' ছবির অফার পান অনিতা। এই ছবি থেকে হিন্দি ছবির জগতে তাঁর প্রবেশ ঘটে। মুম্বইতে অভিনয়ের জগতে যখন পা রাখেন, তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। পরিবারের কেউ ফিল্ম জগতে ছিলেন না, ছিল না তার পূর্ব অভিজ্ঞতা। যেমন যেমন ছবির অফার আসে তাঁর কাছে তিনি সেইসব ছবিগুলিতে কাজ করে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে বাছ-বিচার করেননি। যার ফলস্বরূপ এটাই যে, 'এ' গ্রেড ছবিতে সহনায়িকা হয়েই তিনি থেকে গিয়েছেন। এরই মধ্যে বসন্ত পিকচার্সের কর্ণধার এবং প্রযোজক-পরিচালক হোমী ভিডিয়ো অনিতাকে 'পবনপুত্র হনুমান' ছবিতে সীতার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রস্তাব দেন। পৌরাণিক ছবির ছাপ পড়ে যাবার ভয় তো ছিল। তবুও তিনি এই ছবিতে কাজ করতে রাজি হয়ে যান। এরপর ছবিতে কাজ করার অফার একের পর এক আসতে শুরু করে। তাঁর অভিনীত ছবিগুলির নাম 'সম্পূর্ণ রামায়ণ', 'টিপু সুলতান' 'শঙ্কর', 'সতী অনসূয়া', 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহান', 'সঙ্গীতে সম্রাট তানসেন', 'মহারানি পদ্মিনী', 'সন্ত তুকারাম'। ১৯৭৫ সালে নির্মিত 'জয় সন্তোষী মা' ছবিতে সন্তোষী মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই ছবিটি অনিতা গুহকে পরিচিতি দেয়। যেটা তার একমাত্র কাম্য ছিল। এই ছবিটি হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে সব থেকে সফল ছবির মধ্যে একটি। এই ছবিটিতে অভিনয় করার পর সন্তোষী মা'র চরিত্রে অভিনয়ের পর প্রতি ঘরে-ঘরে, জনে-জনে তিনি বিপুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। মানুষ তাঁকে সন্তোষী মা নামে ডাকতে শুরু করেন। মানুষ তাঁর আশীর্বাদ পর্যন্ত নিতে চায়। ১৯৬১ সালে অভিনেতা মানিক দত্তের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। এবং বিবাহের পর সংসার করতে চলে যান। ঠিক চার বছর তিনি চলচ্চিত্র জগৎ থেকে সরে এসে চুটিয়ে সংসার করেন। তারপর ঠিক চার বছর পর যখন তিনি আবার অভিনয়ে প্রত্যাবর্তন করেন চরিত্রাভিনেত্রী রূপে। এই নতুন ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন 'আরাধনা', 'শর্মিলা', 'অনুরাগ', 'ফিফটি ফিফটি' প্রভৃতি ছবিতে। ২০০৭ সালের ২০ জুন তিনি এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চির বিদায় নেন। ■

সাপ্তাহিক রাশিফল

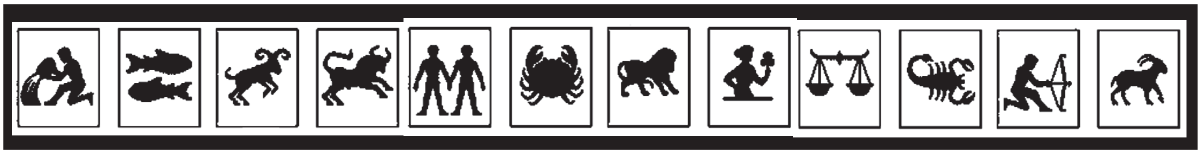

১০ ডিসেম্বর (সোমবার) থেকে ১৬ ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, তুলায় শুক্র, বৃশ্চিকে রবি-বুধ-বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, মকরে কেতু, কুম্ভে মঙ্গল। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র ধনুতে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র থেকে মীনে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে।

মেষ : প্রতিকূল পরিবেশে মানসিক অবসাদ ও অমিতব্যয়িতার পরিচয়। অংশীদারী ব্যবসায় জটিলতা ও সন্তানের বহুমুখী প্রতিভায় বিলম্বিত সাফল্য। মামলা-মোকদ্দমার ফল অনুকূলে আসতে পারে। খনিজ ও পরিবহণ ব্যবসায় নব উদ্যোগে সাফল্য। শিল্পী- কলাকুশলীদের মিষ্টি স্বভাব। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ও প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তি।

বৃষ : স্বামী-স্ত্রীর শরীরের যত্নের প্রয়োজন। কবি-শিল্পী- সাহিত্যিকদের সৃজনশীলতায় নিপুণতা ও শংসা। দৈব-দুর্ঘটনা, কথাবার্তা ও লিখিত কাজে সতর্ক থাকা দরকার। কারিগরী কুশলতায় একাধিক পন্থায় আয়ের যোগ। সম্পত্তি, বাহন ও ভালো সন্তানের যোগ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় প্রতিবেশীর ইতিবাচক পদ।

মিথুন : অগ্রজের উন্নতি, অংশীদারি ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝি। বিদ্যা, কর্মে সাফল্য, গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি, নিকট ভ্রমণ। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, সন্তানের সুকৃতি, পারিবারিক আভিজাত্য বৃদ্ধি। কনিষ্ঠদের যোগ্যতার পূর্ণ মূল্যায়ন। জীবন সঙ্গীর দূরদৃষ্টিতে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও স্বজন সম্পর্কে উন্নতি।

কর্কট : শৌখিন, রুচিবান, আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক ও ভোজন। সফল উদ্যোগ, শত্রুজয়, কর্মে স্বাচ্ছন্দ্য। দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধ। বাড়ি, আত্মীয় পরিবেষ্টিত সামাজিক জীবন। বয়স্কদের রোগের উপশম। জীবিকার নতুন দিশা।

সিংহ : স্বাস্থ্য সুস্থ। আত্মীয় বাৎসল্য, সুখাদ্য ভোজন, বাকচাতুর্যে সুনাম, রাজানুগ্রহ লাভ ও ক্রমবর্ধমান উন্নতি। এক কথায় বিদ্বান পুত্র, কুলশ্রেষ্ঠ, সাংসারিক সুখ ও সদ্ভাব বৃদ্ধি। লাইফ পার্টনারের শরীরের যত্নের প্রয়োজন।

কন্যা : বিদ্যার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক সাফল্য, তবে নির্দিষ্ট সমাজ কেন্দ্রে উপস্থিতিতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। নির্ভীক, স্বাধীনচেতা অনুভবী, সুন্দরের পুজারী, সরলতা ও স্নেহপ্রবণ মন। সপ্তাহের শেষভাগে অমিতব্যয়িতায় বিহ্বল চিত্ত, প্রবাসে রমণীর সান্নিধ্যে অর্থ অপচয়।

তুলা : ছিদ্রান্বেষী ও আইনি জটিলতায় শান্ত-সংযত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিন। জমি-বাড়ি অথবা নতুন কোনও প্রকল্পে বিনিয়োগ। একাধিক বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক। শিল্পী, কলাকুশলী ও চাকরি প্রার্থীদের সুপ্রসন্ন ভাগ্য। শেয়ার, রপ্তানি ব্যবসা, ইলেকট্রিক, কম্পিউটার জগতের ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি। বিত্ত ও অভিজাত গৌরব অর্জন।

বৃশ্চিক : সন্তান-সন্ততি যোগ। সমাজের শ্রদ্ধাবান, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে উজ্জ্বল বুদ্ধি, উদারতা, সৌন্দর্যসুধায় লোকসন্তুষ্টি ও নীতিনিষ্ঠা প্রকৃত সম্মান। বিদ্যার্থীদের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ও মনঃসংযোগ বৃদ্ধি। গৃহকর্ত্রীর বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপে সামাজিক ও সাংসারিক আভিজাত্য বৃদ্ধি। বদহজম ও রক্তচাপ বৃদ্ধি জনিত চিকিৎসার প্রয়োজন।

ধনু : মানসিক অস্থিরতা, কটুবাক্যে সুসম্পর্কের হানি। দ্রব্য হারানো ও বিত্ত প্রতীয়মান। অসৎ সংসর্গ বিশেষত ছলনাময়ীর মায়াজালে পড়া থেকে বিরত থাকুন। সপ্তাহের প্রান্তভাগে ভ্রাতা-ভগ্নী প্রতিবেশীর সাহায্যে জীবনের ঝরাপাতায় নব বসন্তের পরশ। ভ্রমণে সুখ ও মানসিক প্রশান্তি।

মকর : স্নেহপ্রবণ মন। বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ। মার্জিত রুচি, কৃষ্টি, সাহিত্য ও চটুল ম্যাগাজিন ও উপন্যাস পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। গৃহসুখ, মাতৃসুখ, পারিবারিক সম্প্রীতি, বিদ্যা, কর্মে ক্রমবর্ধমান উন্নতি। সপ্তাহের শেষভাগে গৃহকর্ত্রীর শারীরিক চিকিৎসায় ব্যয়াধিক্য যোগ।

কুম্ভ : কটুবাক্য বা বিসদৃশ আচরণে সুসম্পর্কের অভাব। দেব-দ্বিজে ভক্তি। একাধিক পন্থায় অর্থ আয়ের দ্বার উন্মুক্ত। ব্যবসায় নতুন সফল উদ্যোগ। পেশাগত পদোন্নতি, রত্ন, অলংকার লাভ। সামাজিক, আর্থিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বাসস্থান পরিবর্তন। জ্বর-সর্দি হওয়ার সম্ভাবনা।

মীন : জেদ পরিহারে বিরোধিতা কমার সম্ভাবনা। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা তথা অন্যায়, ঘৃণা, মানসিক দৃঢ়তা, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন। সম্মান, কর্মলাভে, কল্যাণে মনোনিবেশ ও জনপ্রিয়তা লাভ। প্রেমজ ব্যাপার সহনশীলতার বাস্তব মূল্যায়ন নাও পেতে পারেন। ক্রীড়াবিদ, পুলিশ, মিলিটারির সফল উদ্যোগ।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য